আদাবুল মুতা'আল্লিমীন

মাওলানা ক্বারী ছিদ্দিক আহমদ

অনুবাদ

মাওলানা মাকসুদ আহমদ

আদাবুল মুতা'আল্লিমীন

মূল

মাওলানা ক্বারী ছিদ্দিক আহমদ

অনুবাদ

মাওলানা মাকসুদ আহমদ

মুহাদ্দিস, আল জামিয়াতুল মাদানিয়া

রাজফুলবাড়িয়া, সাভার, ঢাকা।

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা ✆ 019 24 07 63 65

আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান : ১, ইসলামী টাওয়ার

বাংলাবাজার, ঢাকা ✆ 017 15 07 63 65

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আদাবুল মুতা'ল্লিমীন

মূল মাওলানা ক্বারী সিদ্দীক আহমদ

অনুবাদ মাওলানা মাকসুদ আহমদ
উসতাযুল হাদীস.
আল জামিয়াতুল মাদানিয়া রাজফুলবাড়িয়া, সাভার, ঢাকা

প্রকাশনায় মাকতাবাতুল আযহার
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 9881532 ✆ : 01924 076365

প্রথম প্রকাশ মে ২০১৪ ই.

প্রচ্ছদ নাজমুল হায়দার, সাজ ক্রিয়েশন

বর্ণবিন্যাস মদীনা মাল্টিমিডিয়া : 01911 525070
E-mail : mdFaruque81@gmail.com

সর্বস্বত্ব মাওলানা ওবায়দুল্লাহ
প্রকাশক, মাকতাবাতুল আযহার

মূল্য : ৮০/- [আশি] টাকা মাত্র

E-mail : maktabatulazhar@yahoo.com

ADABUL MUTAALLEMIN

Writer : Maolana Qari Siddiq Ahmad Rh.
Translated by : Maolana Maqsud Ahmad.

Published by : Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 80.00 US $ 5.00 only.

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম আদব	৯
দ্বিতীয় আদব	১৫
তৃতীয় আদব	২২
চতুর্থ আদব	৩০
পঞ্চম আদব	৩৩
ষষ্ঠ আদব	৩৫
সপ্তম আদব	৩৮
অষ্টম আদব	৫৫
নবম আদব	৬২
দশম আদব	৭৩
জামে' নসীহত	৭৭

অবতরণিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আমাদের নেযামে-তা'লীমে যদিও অনেক ভালো দিক রয়েছে, যা নিয়ে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়, কিন্তু এদৎসত্ত্বেও সেখান থেকে আমরা আশানুরূপ ফল তো পাচ্ছি-ই না। বরং আমাদের দ্বীনি মারকায ও মাদারেসে এমনসব ঘটনার অবতারনা হচ্ছে, যা দেখলে দ্বীনি অনুভূতিসম্পন্ন লোকদের লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। বর্তমানকালে হাঙ্গামা ও ধর্মঘটের মতো আত্মঘাতী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরস্পরে যে বিশেষ ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত ছিলো, সেটা এখন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। ছাত্রদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের মর্যাদা স্রেফ একজন চাকুরীজীবীর মতো। আমাদের স্নেহের ছেলেদেরকে কলেজ-ইউনির্ভাসিটির ছেলেদের অনুসরণ করতে দেখা যাচ্ছে। আখলাক, নৈপুণ্য, যোগ্যতা, ইলমী-ইসতে'দাদ শূন্যের কোটায় এসে গেছে। ইখলাছ, লিল্লাহিয়্যত, দ্বীনি দরদ এবং মাযহাবী গায়রতের মত সিফাত থেকে তাদের দূরত্ব বেড়ে চলেছে। এ কারণেই আমাদের ছেলেরা যখন ফারেগ হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তো নিজেকে বিফল ভাবতে থাকে। আর বাস্তবেই তারা বিফল সাব্যস্ত হয়।

যাদের দৃষ্টিতে তা'লীম একটি 'তেজারত', তাদের প্রতি তো কোনো অভিযোগ হতে পারে না, আর তাদের ভূমিকার ওপর আক্ষেপ বা আফসোস করার সুযোগ নেই। কিন্তু যাদের দৃষ্টিতে তা'লীম একটি ইবাদত, তা'লীম একটি চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের বিষয়, তা'লীম হলো সত্য চেনার ও আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একটি মাধ্যম, তা'লীম হলো

দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবী ও সফলতার চাবিকাঠি, তাদের থেকে যদি এ ধরনের ঘৃণিত পদক্ষেপ পাওয়া যায়, তাহলে যদি লজ্জা ও আফসোস না হয়, তাহলে এটা আমাদের অনুভূতিহীন হওয়ারই দলীল হবে। যদি আমাদের দ্বীনি ও কওমী অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে মরে না গিয়ে থাকে, তাহলে এটা অসম্ভব যে, আমরা এসব অবস্থা দেখে অস্থির হবো না এবং এর ইসলাহের জন্য সম্ভাব্য পন্থাগুলোর তালাশে লেগে যাবো না।

আমাদের বর্তমান নেযামে-তা'লীম থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া না যাওয়ার কারণ কী? এটা একটা প্রশ্ন, যা শুধুমাত্র আহলে-ইলমদেরই নয়, বরং ধর্মের প্রত্যেক ব্যথিত হৃদয়েই জাগ্রত হয়।

মূলত, যেকোন কাজ যতো বড় ও যতো উপকারীই হোক না কেন, যদি সেটার সঠিক উপকরণ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, সেটার পথে যেসব প্রতিবন্ধক রয়েছে সেগুলো থেকে বেঁচে না চলা যায়, তাহলে তার থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে না। সহীহ আসবাব হাসিল করা এবং প্রতিবন্ধক দূর করা হলো আশানুরূপ ফল পাওয়ার জন্য 'রূহ'-এর মতো।

আজ আমাদের নেযামে-তা'লীমে সে-রূহ নেই; তা'লীমেও নেই, তা'আল্লুমেও নেই। নচেৎ নিকট-অতীতেই যে ইলম অর্জন করে উম্মতের মধ্যে কাসেম রহ., রশীদ রহ., মাহমূদ রহ., আনওয়ার রহ., ইয়াহইয়া রহ., খলীল রহ.,মাদানী রহ, থানভী রহ, উসমানী রহ., কেফায়াতুল্লাহ রহ. প্রমূখসহ হাযারো এমন ব্যক্তিত্ব পয়দা হয়েছেন, যারা একটি জগতকে পরিতৃপ্ত করেছেন, যারা ইলম ও হেদায়াতের আকাশে চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় চমকিত ছিলেন, যাদের ইলম এ শেষযুগেও সমরকন্দ, বোখারা ও বাগদাদের স্মরণ তাজা করে দিয়েছে; কোনো কারণ নেই যে, আজও সে-ইলম অর্জন করে সেরূপ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হবে না।

আমাদের আলোচ্য কিতাব آداب المتعلمين সে-ইসলাহী কোশেশের একটি অংশ, যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের আদবের উপস্থাপন করা হয়েছে একান্তই সাদাসিধে অথচ হৃদয়গ্রাহীভাবে।

হযরত মাওলানা শাহ সাইয়্যেদ ছিদ্দিক আহমদ সাহেব দা.বা.-এর সত্তা তাঁর ইলমী যোগ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতা এবং খুলূস ও লিল্লাহিয়্যত হিসেবে পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর পুরো যিন্দেগী দরস ও তাদরীস, ইসলাহ ও তাবলীগের জন্য যেনো ওয়াকফকৃত। তিনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর আলোচ্য কিতাবটি রচনা করেন। কিতাবটি সর্বাবস্থায়ই শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী এবং জীবনের জন্য রক্ষাকবচ হওয়ার উপযোগী। আমি আমার 'ইলম ও ফাহম'-এর ত্রুটি স্বীকার করেও নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, পূরো কিতাব পড়ার পর এমনটা অনুভব হয় যে, হযরত মুসান্নিফ দা.বা. তাঁর আল্লাহ-প্রদত্ত মেধা ও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এ সকল আদাবকে 'কিতাব ও সুন্নাহ' থেকে উদ্ঘাটন করে উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোর ওপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ীন ও আকাবেরে উম্মত আমল করে সেগুলোর বরকত ও ফল হাসিল করেছেন। এদৎভিন্ন হযরত মুসান্নিফ দা. বা. ইসলাহের সঠিক পথ নির্দেশনা করে আহলে ইলম ও আহলে তাহকীককে চিন্তা-ফিকিরের দাওয়াত করেছেন।

আশা রাখি, আমাদের তালেবে-ইলমরা এ কিতাবটি হাতে-হাতে নিয়ে পুরোপুরিভাবে উপকৃত হবে।

আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করি, হযরত মুসান্নিফ দা. বা.কে দীর্ঘজীবি করুন এবং তাঁর ইলমী ও রূহানী বরকত দ্বারা উম্মতকে বেশী-বেশী উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল 'আলামীন!

বান্দা আব্দুল কাউয়্যুম মাযাহেরী
জামেয়া ইসলামিয়া, কুলী বাজার, কানপুর, ভারত

লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه الطاهرين

আজকাল দ্বীনি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে কলেজ-ইউনির্ভাসিটির ছাত্রদের রঙ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ-সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে-সব খারাবী প্রকাশ পাচ্ছে, শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষ প্রত্যহ যেগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন; এ-সকল অবস্থা দেখে মনে একথা জাগলো যে, যদি এ ধরনের কোনো পুস্তিকা লিখে দেওয়া যায়, যার মধ্যে ইলমে দ্বীনের আকাঙ্ক্ষীদের, আকাবিরদের 'হালাত'-এর মাধ্যমে তাদের দায়িত্বের অনুভূতি জাগিয়ে দেওয়া যায়, যাতে তারা নিজেদের সংশোধনের দিকে মনোযোগী হবে; তাহলে কওমের প্রদত্ত অর্থ, যা তাদের দেওয়া হয়; তারা এর উত্তম পাত্রই সাব্যস্ত হবে না, বরং ভবিষ্যতে গিয়ে তারা 'এহইয়ায়ে সুন্নাত' ও 'ইছলাহে উম্মত'-এর দায়িত্বও আঞ্জাম দিতে পারবে।

এ বিষয়ে আমি প্রথমে লেখকদের দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু তাঁদের ব্যস্ততা তাঁদের এ কাজের অনুমতি দেয়নি। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরও যখন এ আশা করতে পারিনি যে, আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে এবং কেউ এ ব্যাপারে কলম ধরবে, তো আল্লাহ ওপর ভরসা করে - এ অধমের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও - নিজেই এ কাজ শুরু করলাম। লেখাশেষে আমার মাদরাসার ছাত্রদের শোনালাম।

আল্‌হামদু লিল্লাহ! এর বেশ ভালো আছর দেখা গেছে। অন্যান্য মাদরাসার ছাত্ররাও সেটা নকল করে নিয়েছে। বড়রাও পছন্দ করেছেন। এরপর বন্ধু-বান্ধবদের দাবী উঠলো সেটা ছাপানোর। কিন্তু এর কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। এ জন্য বিভিন্ন কুতুবখানার মালিকদের সাথে আলোচনা করেছি; বলেছি, 'এর কোনো বিনিময় দিতে হবে না। প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনারা সেটা ছাপিয়ে বিক্রয় করুন।' কিন্তু লেখকের অপরিচিতির কারণে তাঁরা সেটা কবুল করতে পারেননি।

শেষপর্যন্ত 'মকতবায়ে রহমানিয়া'র মালিক মাওলানা বাবুদ্দীন সাহেব এর জন্য হিম্মত করে এগিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'জাযায়ে খায়ের' দান করুন এবং এ পুস্তিকাটি কবুল করে ছাত্রদের জন্য উপকারী করুন!

ওয়াস্‌সালাম

আহকার ছিদ্দিক আহমদ বিন সাইয়্যেদ আহমদ

খাদেমুত্তালাবা. জামেয়া আরাবিয়া হাতুরা,

বান্দা, উত্তর প্রদেশ, ভারত

প্রথম আদব
ইখলাছে নিয়্যত

তালিবে-ইলমের জন্য এটা আবশ্যক যে, ইলম হাসিল করার ক্ষেত্রে সকল প্রকার মন্দ নিয়্যত এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্য থেকে তারা তাদের অন্তর মুক্ত রাখবে। ইখলাছ সহকারে আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং নিজের পরকাল দুরস্ত করার জন্য ইলমে-দ্বীন অর্জন করবে।

হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক আমলের ফল তার নিয়্যতের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যার নিয়্যত সে করেছে। যদি ভালো নিয়্যতে একান্তই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কাজ করে থাকে তবে সে সওয়াব পাবে। আর যদি কোনো ফাসেদ নিয়্যত শামিল থাকে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোনো কিছুই নেই।'

অন্য এক জায়গায় তিনি ইরশাদ করেন, 'অনেক আমল এমন রয়েছে যেগুলো বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু ভালো নিয়্যতের ফলে সেগুলো আখিরাতের বিষয়ে পরিণত হয়। আবার অনেক আমল রয়েছে যেগুলো বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে পরকালীন আমলের সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু নিয়্যতের দোষের কারণে তা দুনিয়াবী আমল হিসেবে গণ্য হয়।'

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'যে-ব্যক্তি তার আমলের মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তো আমি তাকে এবং তার আমলকে ছেড়ে দেই। আমি শুধু সে-আমল কবুল করি যা একান্তই আমার জন্য হয়।'

একটি হাদীসে রয়েছে, 'জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যার থেকে জাহান্নাম দৈনিক চারশ'বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে-উপত্যকা হলো রিয়াকার ক্বারীদের জন্য।'

আরেক হাদীসে রয়েছে, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা করছি ছোট শিরকের।' সাহাবায়ে কিরাম

আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী?' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'রিয়া' (লোক দেখানো আমল)।

আরেক হাদীসে এও রয়েছে, 'যেদিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আমলের বদলা দিবেন সেদিন রিয়াকারদের বলা হবে, যাদের দেখানোর জন্য তোমরা আমল করেছিলে, তাদের নিকট গিয়ে দেখো, তাদের নিকট তোমাদের আমলের কোনো বদলা রয়েছে কি না।'

আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়াতে রয়েছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা এ-উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন কোরো না যে, তোমরা আলেমদের ওপর ফখর করবে, জাহেলদের সাথে বহছ করবে এবং মজলিসের উঁচুস্থানে বসবে। যে-কেউ এরূপ করবে তার জন্য দোযখ রয়েছে; দোযখ!'

হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত রয়েছে, 'যে-ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইলম অর্জন করলো, তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেওয়া চাই।'
(জম'উল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আবুদ্দারদা রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক পয়গম্বরের নিকট ওহী পাঠালেন যে, সে-সকল লোকদের বলে দাও, যারা ইলমে দ্বীন আমলের জন্য হাসিল করে না, আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া কামাই করে, তোমরা হলে তারা, যারা লোকদের সামনে ভেড়ার চামড়া জড়িয়ে চলে; অথচ তাদের ভেতর নেকড়ের অন্তর লুকিয়ে রয়েছে। তোমাদের যবান মধু হতেও মিষ্টি। কিন্তু অন্তর যহর হতেও তিক্ত। তোমরা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো এবং আমার সাথে উপহাস করছো। ভালো! আমিও তোমাদের এমন ফিতনায় নিপতিত করবো যার মধ্যে বড়-বড়রাও হতভম্ব হয়ে যায়।'

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.র উক্তি, 'যদি আহলে-ইলম ইলমের কদর করতো এবং তাকে তার স্থানে রাখতো, তাহলে তারা নিজ যমানার সর্দার বনে যেতো। কিন্তু তারা নিজের ইলমের মর্যাদা বজায় রাখেনি; দুনিয়ার কিছু একটি অংশ পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে দুনিয়াদারের পায়ে ঢেলে দিয়েছে; ফল এ হয়েছে যে, তারা অপদস্ত ও হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে।'

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে-ব্যক্তি সকল ফিকিরকে এক ফিকির বানিয়ে নিলো, অর্থাৎ আখিরাতের ফিকর, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার অনেকগুলো ফিকর

নিজের মাথায় জমিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলাও তাকে ছেড়ে দেন যে, যে উপত্যকায় ইচ্ছা, ধ্বংস হয়ে যাক।'

তাঁরই বর্ণনা, একবার তিনি বলেন, 'সে-ফেতনার সময়ে তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যেটার আতঙ্ক শিশুদের বৃদ্ধ বানিয়ে দিবে, আর বৃদ্ধরা তাদের অনুভূতি হারিয়ে ফেলবে। নতুন নতুন নিয়ম বের হবে। লোকেরা চক্ষু বন্ধ করে সেগুলোর ওপর চলবে এবং সেগুলোকে ইসলাম মনে করবে। সেগুলো থেকে যদি কোনো একটি বিদ'আত খতম হয়, তবে শোরগোল উঠবে, 'দেখো! ইসলামের এ সুন্নাতটি খতম করা হচ্ছে।' অথচ সেটা ইসলামের বিষয় ছিলো না।"

উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'হযরত! এরূপ কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে পড়ার লোক অনেক হবে, কিন্তু বোঝার লোক কমে যাবে। যখন তোমাদের সর্দার অনেক হবে, কিন্তু আমানতদার কমে যাবে। যখন আখিরাতের আমল দুনিয়া কামানোর কাজে ব্যবহার করা হবে। আর যখন ইলম আখিরাতের উদ্দেশ্যের পরিবর্তে দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে হাসিল করা হবে।'

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.র উক্তি, 'যদি আহলে-ইলম তাদের ইলমের ইয্যত করতো এবং তদানুসারে আমল করতো, তাহলে আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতারা ও নেককার লোকেরা তাদের সাথে মহব্বত রাখতো এবং সকল সৃষ্টির ওপর তাদের ভয়ের সঞ্চার হতো। কিন্তু তারা তাদের ইলমকে দুনিয়া কামানোর মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলাও তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং সৃষ্টিজগতেও তারা মর্যাদাহীন হয়ে গেছে।'

আবু আব্দুল্লাহ সানজারী রহ. বলেন, 'যার ইলম রিয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত নয়, তার আমলও পাক হতে পারে না। আর যার আমল পাক নয়, তার দেহও পাক নয়। আর যার দেহ পাক নয়, তার অন্তরও পাক হতে পারে না।'

ইয়াযীদ বিন আবী হাবিব বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, مخفى هوس (তথা গোপন লোভ) কী? তিনি বললেন, 'মানুষ ইলম অর্জন করবে; আর মনে-মনে আকাঙ্ক্ষা থাকবে যে, লোকেরা তার চাটুকারী করবে।'

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন, 'বড় আলেমের শাস্তি হলো অন্তরের মৃত্যু।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'অন্তরের মৃত্যু কী?' বললেন, 'আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তালাশ করা।'

তাঁরই উক্তি, 'ইলমে দ্বীন হিফাযত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদেরও নির্ধারণ করে দেন, যারা আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ার উদ্দেশ্যে তা অর্জন করে। আবার এ-ইলমই কিয়ামতের দিন তার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।'

এখন একটু ভেবে দেখো! তোমরা কী হাসিল করছো? এমন যেনো না হয় যে, এ-ইলমই তোমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. বলেন, 'ইলমের জন্য প্রয়োজন প্রথমে নিয়্যতের পরিশুদ্ধতা, তারপর তা বোঝা, এরপর তদানুসারে আমল করা। এরপর তা হিফয করা। এরপর প্রয়োজন হলো এর প্রসারের ও প্রচলনের।'

হযরত সুফয়ান বিন উয়াইনা রহ. তালিবে-ইলমদের বলতেন, 'ইলম হাসিল করার জন্য নিয়্যতকে নির্ভেজাল রাখো এবং নফসের কামনা কমিয়ে রাখো। কারণ, খোদার কসম! যদি আমি নফসের সকল ইচ্ছা পূরণ করতাম, তবে আমার ভয় ছিলো ইলমের খিদমত ছেড়ে দিয়ে হুকুমতের কোনো চাকুরী করতাম। কারণ, ইলম-চর্চার মধ্যে দুনিয়া অনেক পরিমাণে অর্জন হয় না। কাজেই যদি সম্পর্ক ও কামনা কমানো না হয়, তাহলে অনর্থক অধিক পরিমাণ সম্পদের অন্বেষণ করা হবে। তো সে-ক্ষেত্রে আশঙ্কা হচ্ছে যে, ইলম ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার ধান্দায় ফেঁসে যাবে।'

বর্তমানে এটা খুব ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, হাযারো তালিবে-ইলমের মধ্য থেকে পাঁচ-দশ জনই এমন হয়, যারা দুনিয়ার সামান্য সম্পদে সন্তুষ্ট থেকে দ্বীনের খিদমত করে যাচ্ছে। অধিকাংশই তো অন্যান্য কাজে লিপ্ত হয়ে ইলমকে বিনষ্ট করে বসে। কারণ, খানা-পিনা ও 'সাজ ও সামানে'র জন্য মাদরাসায় প্রাপ্ত সামান্য বেতন যথেষ্ট হয় না। তাই আয় বৃদ্ধির জন্য অন্য ধান্দায় লেগে যায়। কেউ চিকিৎসা পেশায় লেগে যায়। কেউ ইংরেজী পরীক্ষা দিয়ে কলেজের প্রফেসারী করে। কেউ বোর্ডের পরীক্ষায় লেগে যায়। এরপর ইউনির্ভাসিটির কোনো শাখায় ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে। কেউ দুনিয়ার অন্য কোনো ধান্দায় লেগে যায়, যার ফলে ইলমের 'নাম ও নিশান'ও তার মধ্যে বাকী থাকে না। নচেৎ এ যে হাযার-হাযার মাদরাসার তালেবে-ইলম প্রতিবছর বিভিন্ন মাদরাসা থেকে ফারেগ হচ্ছে, তারা যদি প্রত্যেকেই তাদের দায়িত্ব বুঝতে পারতো এবং আল্লাহর দরবারে মুহাসাবা হওয়ার ফিকির করতো, তাহলে ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও ইলমে দ্বীনের খিদমত ব্যতীত নিজের জন্য কোনো পেশা গ্রহণ করতো না বা অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপকরণও পেতো না। যদি

এমন হতো, তাহলে কি উম্মতের মধ্যে এ পরিবর্তন আসত? এমন কি হতো যে, ষাট-সত্তর বছর বয়সের মুসলমানও কালিমা তাইয়্যেবা থেকে গাফেল হয়ে মারা যায়? এমন কি হতো যে, বি.এ., এম.এ. পাশ করা ছেলেকে যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থানের নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলে, তাঁর জন্মস্থান হলো 'কাশী'?

বর্তমানে একথার ওপর আনন্দ প্রকাশ করা হয় যে, অমুক-অমুক আরবী মাদরাসার ফারেগীনদের হাই স্কুল ও ইন্টারমেডিয়েটের সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত দু'তিন বছর চেষ্টা করে বি.এ. করতে পারবে। একথাটি তারা ইশতিহারের মাধ্যমে এবং লিফলেটের মাধ্যমে কোনায়-কোনায় প্রচার করে বেড়ায়। এমনকি মাদরাসার বার্ষিক রিপোর্টের শুরুভাগে 'খোশখবরী'-র শিরোনামে মাদরাসার বিরাট কামিয়াবী ও কারগুযারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আর কওম থেকে এর কারণে প্রশংসাও আদায় করা হয়। কিন্তু ঐ মাদরাসার কর্তৃপক্ষ একথাটা এতোটুকুও ভেবে দেখেন না যে, কোনো কলেজ-ইউনিভার্সিটির এ উদারতা মাদরাসার জন্য কতোটুকু ক্ষতিকর। এমন তালেবে-ইলম অনেক দেখানো যাবে, যারা হাদীস শরীফ থেকে ফারেগ হওয়ার পর উম্মতের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বদের দস্তখত দ্বারা তার সনদ সজ্জিত করার পর যখন ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছলো এবং তাদের প্রিয়(!) কাজে লেগে গেলো, তো তাদের দেখে মুসলমান ধারণা করাও কঠিন হয়ে গেছে। তাদের মুখ থেকে একথাও শোনা গেছে যে, 'আমরা দ্বীনী মাদরাসায় থেকে নিজেদের জীবনটা ধ্বংস করেছি।'

এখানে হযরত মাওলানা মনযূর আহমদ নো'মানী সাহেব রহ.র একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করছি, যার মধ্যে মুসলমানদের এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তাদের সন্তানদের জন্য দ্বীনী ইলম হতে উত্তম কোনো ক্ষেত্র নেই।

মাওলানা রহ. বলেন-

'মানুষ সামান্য দ্বীনী অনুভূতি ও হুসনে-নিয়্যতসহ পরকালীন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের খাদেম বানানোর দৃঢ় ইচ্ছা করে নিক, এরপর দেখুক যে আল্লাহ তা'আলার মু'আমালা কীরূপ হয়। فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا-র মত দয়াময় শানের কিছু-না-কিছু নমুনা প্রত্যেক ঐ-ব্যক্তি অবশ্যই দেখতে পাবে, যে সঠিক অন্তরে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার ভবিষ্যত থেকে চোখ ফিরিয়ে আল্লাহর ওপর

ভরসা ও নির্ভর করে তাদের সন্তানদের দ্বীনী খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দেয় এবং তার জন্য সঠিক কার্যপদ্ধতি নির্বাচনেও ত্রুটি না করে। আমার তো আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানীর ওপর দৃঢ় আস্থা রয়েছে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে আমার কথা শুনে ও মানে, এ-ওসিয়্যত করি যে, সে তার সন্তানকে আল্লাহর 'ফযল ও করমে'র ওপর ভরসা করে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনেরই নযর করবে। তার সন্তানের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো ক্ষেত্র নেই। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আপনি আপনার সন্তানকে বে-রোযগার ও পঙ্গু বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিন। বরং আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটা যে, আপনি তার লেখা-পড়া, শিক্ষা-দীক্ষা এমন করুন যে, যিন্দেগী দ্বীনের জন্য ও জীবিকা পরকালের জন্য- এ দৃষ্টিভঙ্গি সে তার মধ্যে সৃষ্টি করে নিজেকে দ্বীনের বাহক ও খাদেম বানিয়ে নেয়।'

দ্বিতীয় আদব

মন্দ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা

তালিবে-ইলমের জন্য উচিত হলো, সে নিজের নফসকে নিকৃষ্ট অভ্যেস ও খারাপ সিফাত থেকে পবিত্র রাখবে। মিথ্যা, গীবত, মিথ্যা অপবাদ, চুরি, অনর্থক কথাবার্তা ও খারাপ সাহচর্য থেকে নিজেকে সব সময়ে বাঁচিয়ে রাখবে। কারণ, ইলম হলো দিলের ইবাদত, যা একটি বাতেনী বিষয়। তো যেমনিভাবে নামায, যা একটি বাহ্যিক ইবাদত, তাহারত ছাড়া দুরস্ত হয় না; তেমনিভাবে ইলম, যা একটি বাতেনী ইবাদত, বাতেনী তাহারত ছাড়া হাসিল হয় না। (এহইয়াউল উলূম)

'তা'লীমুল মুতা'আল্লিম' কিতাবে একটি হাদীস নকল করা হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে-ব্যক্তি তালেবে-ইলমীর যমানায় গুনাহ হতে বেঁচে থাকে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি মসিবতের যে-কোন একটির মধ্যে অবশ্যই লিপ্ত করেন। হয়তো সে যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করে। অথবা মান-মর্যাদা ও ইলম-কালাম থাকা সত্ত্বেও এমনসব জায়গায় ঘুরে-ঘুরে মরবে যেখানে তার ইলম বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে ইলমের প্রসার করতে পারে না। অথবা কোনো বাদশাহ বা সর্দারের খিদমতে থেকে থেকে লাঞ্ছনা বরদাশ্‌ত করে। তালিবে-ইলম যদি পরহেযগার হয়, তাহলে তার ইলম দ্বারা লোকেরাও উপকৃত হবে। আর তার জন্য ইলমের পথ নিজে-নিজেই খুলে যাবে।'

জনৈক ফকীহে-যাহেদ এক তালিবে-ইলমকে নসীহত করে বলেছেন, 'দেখো! গীবত থেকে বেঁচে থাকবে। অনর্থক কথা-বার্তা বলে, এমন তালিবে-ইলমের সাহচর্যে থাকবে না। যে-ব্যক্তি অর্থহীন কথায় লিপ্ত থাকে, সে তোমার ও তার উভয়ের সময় নষ্ট করে। গোনাহগার ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের থেকে দূরে থাকা এবং নেককারদের সাহচর্যে থাকাও তাকওয়ার একটি প্রকার।'

হযরত শকীক বলখী রহ. বলেন, তিনটি বিষয়ের আমল করা ব্যতীত ফায়দা হয় না- যদিও সে আশি সিন্দুক কিতাব পড়ে নেয়।

১. দুনিয়ার প্রতি মহব্বত রাখবে না। কারণ, এটা মুসলমানদের ঘর নয়।

২. শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে না। কারণ, সে মুসলমানের বন্ধু নয়।

৩. কাউকে ব্যথা দিবে না। কারণ, এটা মুসলমানদের কাজ নয়।

হযরত মায়মূন বিন মেহরান রহ.র উক্তি- 'ইলম পড়া ও তা বৃদ্ধি হওয়া অর্থহীন- যে পর্যন্ত না আনুগত্য ও ভয় তার সাথে থাকে।'

শেখ সা'দী রহ. বলেন-

'তুমি যতোই ইলম অর্জন করো না কেন, যদি তোমার মধ্যে তদানুসারে আমল না থাকে তাহলে তুমি না-দান (অজ্ঞ)। যে চতুষ্পদ জন্তুর ওপর কিতাব রেখে দেওয়া হয় সে মুহাক্কিক্ব বা জ্ঞানী হয় না।'

আব্দুর রহমান বিন কাসেম রহ. বলেন, 'আমি বিশ বছর ইমাম মালেক রহ.র খিদমতে ছিলাম। তন্মধ্যে আঠারো বছর আদব ও আখলাকের শিক্ষায় ব্যয় হয়েছে, আর দু'বছর ইলম অর্জনে।'

জনৈক বুযুর্গ বলেন, 'চেরাগ যেমনিভাবে জ্বালানো ব্যতীত আলো দেয় না, তেমনিভাবে ইলমও আমল ব্যতীত ফায়দা দেয় না।'

হযরত মা'রূফ কারখী রহ. বলেন, 'মজাদার কথা বলার জন্য ইলম অর্জন করো না যে, যা কিছু শুনেছো তদানুসারে আমল করা ব্যতীতই তা অন্যের নিকট বর্ণনা করে দিলে। ইলম শুধুমাত্র আমল করার জন্যই অর্জন করা চাই। খোদার কসম! যদি আমলের জন্য ইলম তলব করা হতো, তাহলে প্রত্যেকটি কথা তিক্ত ঔষধের মত গিলে গিলে পান করতো, এ মজা ও আনন্দ ভুলে যেতো।'

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী রহ. বলেন, 'ইলমের একটি মূল্য রয়েছে। সেটা উসূল করা ব্যতীত কাউকে ইলম দান কোরো না।' লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'সে-মূল্য কী?' বললেন, 'ভালোভাবে সেটাকে অন্তরে স্থান দেওয়া, বিনষ্ট না করা। যে প্রথমে মূল্য পেশ করবে তাকে ইলম দান করো।'

হযরত আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রাযী রহ. ইরশাদ করেন, 'আজকাল লোকদের অবস্থা এমন যে, তারা তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত। জেনে-শুনেও তার ওপর তারা স্থির রয়েছে। সঠিক পথে আসতে চায় না। কারণ হলো, তারা ইলম অর্জন করে তার ওপরই গৌরব করছে। অহঙ্কার ও আত্মরম্ভিতায় লিপ্ত রয়েছে। এর দ্বারা কাজ নেওয়ার ইচ্ছে তাদের নেই। আমলের মধ্যে মশগুল হয়নি। যাহেরী কথার মধ্যে আলোচনা করে। বাতেনী ও ক্বলবী রোগের আলোচনা ছেড়ে দিয়েছে। তো খোদা তা'আলাও সরল পথ দেখা থেকে তাদের অন্ধ করে দিয়েছেন; আর যাহেরী অঙ্গকে অনুগত্য করা থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন।'

হযরত শা'বী রহ. বলেন, 'ইলম অর্জন করার সময় কাঁদতে থাকো। কারণ, তোমরা শুধু ইলমই অর্জন করছো না। বরং নিজের ওপর হুজ্জতে-এলাহী (আল্লাহ পাকের দলীল) ভালোভাবে সাব্যস্ত করছো।'

হযরত মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন সাহেব কান্ধুলভী রহ.র জীবনীতে রয়েছে, 'ছাত্রাবস্থায় তিনি বাজার হতে শুধুমাত্র রুটি কিনে নিতেন। তরকারী এ কারণে কিনতেন না যে, দোকানের মধ্যে যে-তরকারী পাক করা হতো, তার মধ্যে আমের টক দেওয়া হতো। আর তখনকার দিনে আমের বাগান বিক্রয়ের যে নিয়ম ছিলো তা শরীয়ত-সম্মত ছিলো না। তাই তিনি তরকারী ছাড়াই রুটি খেয়ে নিতেন। তালেবে-ইলমী যিন্দেগীর এ সতর্কতার ফল এমন হয়েছিলো যে, সন্দেহযুক্ত মাল হযরতের পেটে সইতো না। যদি কোথাও ভুলক্রমে খেয়ে ফেলতেন তো তৎক্ষণাৎ বুমি হয়ে যেতো।'

হযরত মাওলানা ওছীউল্লাহ সাহেব রহ.কে তাঁর তালেবে-ইলমীর যমানায় দারুল উলূমের মুহতামিম সাহেব কোনো একটি কাজে থানাভবন হযরত থানবী রহ.র খিদমতে পাঠালেন। ভাড়ার পয়সা থেকে কিছুটা বাকী রয়ে গিয়েছিলো। তিনি তা মুহতামিম সাহেবের নিকট ফেরত দিয়ে দিলেন।

তাঁরই আরেকটি ঘটনা। তিনি যে ঘরে অবস্থান করতেন সে ঘরের সামনে একটা নিম গাছ ছিলো। কয়েকজন এর হকদার ছিলো। মেসওয়াকের প্রয়োজন হলে তিনি সবার থেকে অনুমতি নিয়ে সে-গাছ থেকে মেসওয়াক নিলেন।

হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব মুহাদ্দেসে-সাহারানপুরী রহ. মাযাহেরুল উলূমের কাজে কলকাতা গিয়েছিলেন। তার এহতিয়াত (সতর্কতা) এ পর্যায়ের ছিলো যে, তিনি সেখানে আপন কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন। রিক্সাভাড়া নিজের পক্ষ থেকে দিয়েছিলেন। অথচ তার সাথে সাক্ষাত করার ফলে মাদরাসার অনেক লাভ হয়েছিলো।

মাওলানা এনায়েতুল্লাহ সাহেব, যিনি মাযাহেরুল উলূম মাদরাসা, সাহারানপুরের মুহতামিম ছিলেন, তিনি এবং হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব মুহাদ্দিসে-দেহলভী রহ. মাদরাসার কোনো বস্তু নিজের জন্য ব্যবহার করতেন না। এমনকি মাদরাসার কাজ ছাড়া মাদরাসার বিছানায়ও বসতেন না। সে-সকল আকাবিরের তাকাওয়ার ফল এ হয়েছিলো যে, এ অধম স্বীয় ওস্তাদ মাওলানা সাইয়্যেদ যহুরুল হক সাহেবকে দেখেছে যে, জলসার সময়ে তিনি বোর্ডিংয়ের নাযেম হয়েছেন। কিন্তু বাড়ি হতে খাবার এনে খেয়েছেন।

এ ধরনের হাযারো ঘটনা আমাদের আকাবেরদের রয়েছে, যারা দিয়ানত, আমানত ও তাকওয়ার সাথে কাজ করে দুনিয়ার জন্য একটি অনুকরণীয় নমুনা রেখে গেছেন। আজকাল মাদরাসার মালকে মালে-গনীমত মনে করা হয়। যার আয়ত্বে যা আসে, সে সেটাকে মিরাছ মনে করে। বরং এখন অনেকে মাদরাসা এ উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা করে যে, আয়ের একটি সহজ উপায় হবে।

এক বুযুর্গ এক তালিবে-ইলমের ঘটনা শুনিয়েছেন, যে দিল্লীতে পড়ালেখা করতো এবং একটি মসজিদে থাকতো। সে-মহল্লার এক মহিলা তার আত্মীয়ের সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছিলো। ঘটনাচক্রে সেখানে গোত্রীয় দাঙ্গা শুরু হলো। সে-মহিলা ঐ-মসজিদই আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখতে পেলো। রাতের বেলা ছিলো। তালিবে-ইলম সে-মহিলাকে দেখে ঘাবড়ে গেলো। তার থেকে উযরখাহী করতে লাগলো যে, এখানে থাকা আপনার জন্য নিরাপদ নয়। লোকেরা দেখতে পেলে আমার অপমান হবে এবং আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দেবে। এতে আমার তা'লীমের ক্ষতি হবে। সে-মহিলা অবস্থা বর্ণনা করে বললো, 'এখন আপনিই বলুন, এ অবস্থায় আমার চলে যাওয়ার মধ্যে বে-ইজ্জতীর আশঙ্কা রয়েছে।' তালিবে-ইলম চুপ হয়ে গেলো। তাকে মসজিদের একটি কোণে বসতে বললো। নিজে কক্ষে গিয়ে মুতালা'আয় লেগে গেলো। রাতভর মুতালা'আ করলো। মুতালা'আর সময়ে বারবার চেরাগের আগুনে আঙ্গুল রেখে দিতো। সারারাত এভাবেই কাটলো। মহিলা এ সবকিছু দেখতে থাকলো। যখল সকাল ঘনিয়ে এলো তো তালিবে-ইলম সে মহিলাকে বললো, দাঙ্গাকারীরা নিজ-নিজ ঘরে চলে গেছে। এখন রাস্তা পরিষ্কার। আপনি চলুন। আমি আপনাকে আপনার ঘরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। সে-মহিলা বললো, 'আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত যাবো না যে পর্যন্ত আপনি আমাকে এর রহস্য বলবেন না যে, আপনি বারবার চেরাগে আঙ্গুল রাখছিলেন কেন?' তালেব ইলম বললো, 'এতে আপনার প্রয়োজন কী? আপনি এর পিছে পড়বেন না।' কিন্তু মহিলা যখন ছাড়ছেই না তখন সে বললো, 'শয়তান বারবার আমার মনে প্ররোচনা দিচ্ছিলো এবং খারাপ কাজের জন্য উৎসাহী করছিলো। তাই আমি আগুনে আঙ্গুল রেখে দিতাম এবং নিজেকে লক্ষ্য করে বলতাম, এ দুনিয়ার সামান্য আগুন যখন তুমি সহ্য করতে পার না তো জাহান্নামের আগুনের ওপর কেন বাহাদুরী দেখাও? আল্লাহর শোকর! তিনি আমাকে হিফাযত করেছেন।' একথা শুনে মহিলা তার বাড়ি চলে গেলো। মহিলা ছিলো এক সম্পদশালীর মেয়ে। তার বিবাহ আরেক সম্পদশালীর সাথে হওয়ার কথা ছিলো। সে-মহিলা ঐ আত্মীয়তা অস্বীকার করে বসলো। মা-বাবাকে বললো, 'আমি অমুক তালিবে-ইলমের সাথে বিবাহ করবো।' মা-বাবা ও অন্যান্য সকল আত্মীয়-স্বজন তাকে বোঝাতে লাগলো। অনেকে আবার খারাপ ধারণাও করতে লাগলো। মহিলা যখন এসব দেখতে পেলো, তো পুরো ঘটনা তাদের খুলে বললো। তারপর বললো, 'আমি তাকে বিবাহ করবো। তার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে। আর যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে সে অপরকে কষ্ট দেয় না।' শেষপর্যন্ত ঐ তালেবের সাথেই সে-মহিলার বিবাহ হলো। আর সে ঐ বাড়ির মালিক হয়ে গেলো।

সত্যি, যে-ব্যক্তি হারাম থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য হালাল পন্থার ব্যবস্থা করে দেন। বর্তমানের তালিবে-ইলমের মধ্যে বদ-আমলী বেড়ে যাচ্ছে। তাকওয়া, দিয়ানত, তাওয়াযূ' ইনকিসারীর নামও নেই। যাহেরী আমলেরও পাবন্দী তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। নামাযের জামা'আতেরও গুরুত্ব তাদের মধ্যে নেই। মন-মানসিকতা সবসময়ে ফাসাদের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। যখন তালিবে-ইলম অবস্থায় ও দ্বীনী পরিবেশে থেকেও নিজেকে গঠন করতে পারে না তো অন্যের যিন্দেগী কীভাবে দুরস্ত করবে?

اللهم احفظنا و وفقنا لما تحب و ترضى

এক তালিবে-ইলম ইশার নামাযের জামা'আতের কিছুক্ষণ পরই একটি চেরাগ নিভিয়ে দিয়ে আরেকটি চেরাগ জ্বালিয়ে নিলো। ঘটনাক্রমে সেখানে এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি এসব দেখে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, 'এটা ছিলো মসজিদের চেরাগ। যতোক্ষণ পর্যন্ত সেটা জ্বালানোর অনুমতি রয়েছে ততোক্ষণ পর্যন্ত সেটা জ্বালাই। এরপর নিজের তেল জ্বালিয়ে মুতালা'আ করি।' সে-বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ইসলাহী তা'আল্লুক কার সাথে?' তালিবে-ইলম বললো, 'হাকীমুল উম্মত রহ.র সাথে।' বুযুর্গ বললেন, 'এর তো এ-ই আছর হওয়া চাই!'

তালিবে-ইলম যদি প্রকৃতই ইলম দ্বারা উপকৃত হতে চায় এবং অন্যকে উপকৃত করতে চায়, তো নিজের ইসলাহ হতে কখনো গাফেল না হওয়া চাই। এর সহজ সূরত হলো, কোনো বুযুর্গের সাথে নিজের ইসলাহী তা'আল্লুক কায়েম করবে এবং প্রতিটি কাজ তাঁর সাথে পরামর্শ করে করবে।

আমার সাইয়্যেদ হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. আবু দাউদ শরীফের সবকে একদিন বললেন, 'তালিবে-ইলম যদি তালিবে-ইলমের যমানায় 'ছাহেবে নিসবত' না হলো তো সে কোনো কিছুই হলো না।'

এরপর বললেন, 'মাওলানা ইবরারুল হক সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা তালিবে-ইলমীর যমানায়ই এ দৌলত দান করেছেন। সে নিসবত ও তা'আল্লুক মা'আল্লাহর ফল এই যে, বর্তমানে ইসলাহে উম্মতের বিরাট কাজ আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে নিচ্ছেন। কারো মনে চাইলে 'হারদুঈ' গিয়ে দেখে আসতে পারে।'

'তা'লীমুল মুতা'আল্লিম' কিতাবে রয়েছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ঘরে কোনো ছবি বা কুকুর থাকে ফেরেশতা সে ঘরে প্রবেশ করে না।' আর মানুষ যখন তার তা'লীম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অর্জন

করে, তো তার জন্য আবশ্যক হলো নিন্দনীয় আখলাক - যাকে পাপ বলা হয় - তা থেকে বেঁচে থাকা, যেনো তা এ ইলম অর্জনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

এক জায়গায় লেখা রয়েছে, তালিবে-ইলমের জন্য জরুরী হলো, আদাব ও সুন্নাতের বিষয়ে অলসতা ও গাফলতী না করা। কারণ, এটা স্বীকৃত বিষয় যে, যে-ব্যক্তি আদাবের মধ্যে অবহেলা করবে সে সুন্নাতের মধ্যে অবহেলা করবে। আর সুন্নাতের মধ্যে অবহেলা ও গাফলতীর ফল এ হবে যে, তার থেকে ফরয তরক হয়ে যাবে। আর ফরয আদায়ের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটিও পরকালীন নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকার নিদর্শন। তালিবে-ইলমের জন্য অধিক পরিমাণে নামায পড়া প্রয়োজন। আর খুশু'-খুযূ'র প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। এগুলো ইলম অর্জনে সহায়ক ও বরকতের কারণ হবে।

সুন্নাতের পাবন্দীর ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে একটি ঘটনা নকল করা হয়েছে। দু' জন তালিবে-ইলম ইলম হাসিল করার জন্য সফরে বের হলো। উভয়ে হামসবক (সহপাঠী) ছিলো। দু' বছর পর যখন উভয়ই বাড়ি ফিরল তো তাদের একজন ছিলো ফকীহে-কামিল। অপরজন ছিলো 'ইলম ও কামাল'শূন্য। সেখানকার উলামা এ বিষয়ে ভাবলেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তো তারা জানতে পারলেন, যে ফকীহে-কামিল হয়ে এসেছে, সে সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পুরোপুরি তার পাবন্দ ছিলো। অপরজন এমন ছিলো না।

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া বলেন রহ. বলেন, 'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়া চাই। কোনো মুস্তাহাব বা সুন্নাত ফউত না হওয়া চাই।'

'বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন' কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.র অবস্থা লেখা হয়েছে যে, একবার তিনি শাম দেশে একটি কলম ধার হিসেবে নিয়েছিলেন। সেটা ফেরত দিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিলেন। নিজ দেশ মারভে চলে এলেন। সেখানে এসে কলম ফেরত দেওয়ার কথা মনে হলে তিনি আবার শাম দেশে সফর করলেন। তিনি এও বললেন, 'আমার নিকট সন্দেহযুক্ত একটি দেরহাম ফেরত দেওয়া আল্লাহর রাস্তায় লক্ষ দেরহাম খরচ করা হতে উত্তম।' তাঁর মৃত্যুর পর জনৈক বুযুর্গ স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, কেউ একজন বলছে, 'আব্দুল্লাহ বিন মুবারক জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছে গেছেন।'

'রহমাতুল মুতা'আল্লেমীন'-এর লেখক বলেন, 'পানাহারের ব্যাপারে তালিবে-ইলমের জন্য জরুরী হলো সতর্কতার সাথে কাজ করা। হালাল খাবার খাবে। হারাম থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- يا ايها الرسل

كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا। মুফাস্‌সিরগণ এর রহস্য লিখেছেন যে, اكل طيب তথা হালাল খাবারকে এ কারণে মুকাদ্দম করা হয়েছে যে, عمل صالح-এর ক্ষেত্রে اكل طيب-এর বেশ একটা দখল রয়েছে। হালাল রুযি ব্যতীত আমলে সালেহ হয় না।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছেন-

اللهم انى اسئلك رزقا طيبا و علما نافعا و عملا متقبلا

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট রিযকে-হালাল, ইলমে নাফে' ও কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।'

তৃতীয় আদব

উস্তাদের আদব

তালিবে-ইলম নিজের ওপর উস্তাদের আদব আবশ্যকীয় মনে করবে।

হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ইলম অর্জন করো। ইলমের জন্য গাম্ভীর্যতা ও মাহাত্ম্য সৃষ্টি করো। আর যাঁর থেকে ইলম অর্জন করো তাঁর সাথে বিনয়ের আচরণ করো।'

এক জায়গায় ইরশাদ করেন, 'বৃদ্ধ মুসলমান ও আলেম, হাফেযে কোরআন, ইনসাফগার বাদশাহ ও উস্তাদের ইয্যত করা আল্লাহর তা'যীমের মধ্যে শামিল।'

ইবনে ওহব বলতেন, 'ইমাম মালেক রহ.র আদব দ্বারা আমার যা অর্জন হয়েছে ইলম দ্বারা তা অর্জন হয়নি।'

শো'বা রহ. বলেন, 'যাঁর থেকে আমি একটি হাদীসও শুনেছি আমি তাঁর গোলাম।'

উস্তাদের সামনে কথা অধিক না বলে তাঁর থেকে মনোযোগ সহকারে শোনো। তাঁর সামনে কথা অধিক বলা বেয়াদবী। কোনো কথা বুঝে না আসলে আদব রক্ষা করে জিজ্ঞেস করো।

হযরত হুসাইন রাযি. তাঁর সাহেবযাদাকে নসীহত করে বলেছেন, 'উস্তাদের সোহবতে থাকার সময়ে অধিক বলার চেষ্টা না করে শিখার চেষ্টা করবে।'

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.র বর্ণনা, 'আমি দু' বছর যাবৎ ইচ্ছে করে রেখেছি যে, আমীরুল মু'মেনীন হযরত উমর ফারুক রাযি.র নিকট একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু তাঁর আদব ও ভীতির কারণে জিজ্ঞেস করার হিম্মত হয়নি। একবার হজ্জের সময়ে মাররুয্যাহরান নামক স্থানে তিনি কাযায়ে-হাজত হতে ফারেগ হয়ে ফেরত আসার সময়ে আমি মনে সাহস যুগিয়ে আরয করলাম, 'আমিরুল মু'মেনীন! দু' বছর যাবৎ একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি। কিন্তু আপনার ভয়ে বলতে পারিনি।' তিনি বললেন, 'এরূপ কোরো না। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করো। জানা

থাকলে জানিয়ে দিবো। নচেৎ বলে দিবো, আমি জানি না; অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও।'

তদ্রূপ হযরত সা'য়ীদ বিন মুসাইয়্যেব রহ. বলেন, 'আমি সা'য়ীদ বিন মালেক রহ.কে বললাম, 'হযরত! আপনার নিকট কিছু জিজ্ঞেস করার ছিলো। কিন্তু ভয়ে যবান খুলছে না।' তিনি বললেন, 'ভাই! আমার থেকে কখনো ভীত হয়ো না। যা কিছু জিজ্ঞেস করার, নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করো।' বললাম, 'আমার জিজ্ঞাসা ছিলো, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে হযরত আলী রাযি.কে কী বলেছিলেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি বলেছিলেন, হে আলী! তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, আমার সাথে তোমার সে নিসবত হোক, যে নিসবত হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের সাথে তাঁর ভাই হযরত হারুন আলাইহিস্সালামের ছিলো?'

ইমাম আহমদ রহ. আদবের কারণে তাঁর উস্তাদের নাম নিতেন না। বরং কুনিয়্যাত দ্বারা তাঁদের উল্লেখ করতেন।

ইমাম বুখারী রহ.কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার অন্তরে কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে কি?' তিনি বললেন, 'আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আমার উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রহ. জীবিত থাকতেন; আর আমি তাঁর সাহচর্যে থাকতে পারতাম।'

ইমাম রবী' রহ. বলেন, 'আমি আমার উস্তাদ ইমাম শাফে'য়ী রহ.র চোখের সামনে পানি পান করারও সাহস পেতাম না।'

ইমাম শাফে'য়ী রহ. বলেন, 'আমি আমার উস্তাদ ইমাম মালেক রহ.র সামনে কাগজের পাতাও আস্তে করে উল্টাতাম যেনো কোনো আওয়ায না হয়।'

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, 'উস্তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা আবশ্যক। আর তাঁর কঠোর আচরণও সহ্য করে নেওয়া চাই। উস্তাদ যদি কোনো ভালো কথা বলেন বা কোনো মন্দ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেন, তো তাঁর শোকরগুযারী করা উচিত। তিনি যদি কোনো সূক্ষ্ম কথা বলেন, আর সে কথা পূর্ব থেকেই জানা থাকে, তবুও একথা বলবে না যে, একথা তো আমার জানা আছে।'

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.কে তার এক শামদেশীয় ওস্তাদ সাধারণ একটি কথার ওপর- যা ভুল বোঝা থেকে সৃষ্ট হয়েছিলো- বেদমভাবে প্রহার করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে বা তার পরেও তার অন্তরে সামান্য মলিনতাও সৃষ্টি হয়নি। বর্তমানে আরব-আজম সবখানেই হযরত মাওলানার যে

মর্যাদা এবং আল্লাহ পাক তাঁর থেকে দ্বীনের যে খিদমত নিচ্ছেন, দুনিয়া তা দেখছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ছায়া নিরাপদে বাকী রাখুন এবং তাঁর ফয়েয ও বরকত দ্বারা জগৎবাসীকে পরিতৃপ্ত করুন!

বুযুর্গগণ বলেছেন, 'উস্তাদের সামনে আদব সহকারে বসবে। তাঁর সাথে বসবে না। যদি তিনি বলেন, তবুও বসবে না। হ্যাঁ, যদি তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে বসার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। তাঁর সামনে বড়ই আদব সহকারে কথা বলবে। 'কেন?' 'মানি না!' এ ধরনের কথা বলবে না।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, 'নিজের উস্তাদদের দোষ বলবে না। তা না হলে তোমাদের ছাত্ররাও তোমাদেরকে দোষ বলবে।'

এটাও উস্তাদের হক যে, ফারেগ হওয়ার পরও তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ বজায় রাখবে। 'শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া'য় একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ইমাম হালওয়ানী রহ. বোখারা থেকে অন্যত্র তাশরীফ এনেছিলেন, তো ইমাম যরনূজী রহ. ব্যতীত ঐ এলাকার সবাই সফর করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। অনেকদিন পর যখন ইমাম যরনূজী রহ.র সাথে সাক্ষাৎ হলো তো তিনি অনুপস্থিতির ওপর আফসোস প্রকাশ করে উযরখাহী করলেন যে, মায়ের খিদমতের কারণে উপস্থিত হতে পারিনি। তখন ইমাম হালওয়ানী রহ. বললেন, 'তুমি অবশ্যই দীর্ঘজীবী হবে, তবে দরস নসীব হবে না। পরবর্তীতে এরূপই হলো।'

আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহমান সাহেব - যিনি মাযাহেরুল উলূম মাদরাসার মুহাদ্দিস ও সদরে মুদাররিস ছিলেন - নিজের একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি যখন নিজের দেশ ছেড়ে পড়ালেখার জন্য সাহারানপুর এসেছি তো প্রত্যেক উস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। তবে এক উস্তাদ - যার থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছি - তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। যখন সাহারানপুর পড়ালেখা শুরু করলাম, তো কিতাব মোটেই বোঝে আসছিলো না। অথচ আমাকে আমাদের জমা'আতের সমঝদার ছাত্রদের থেকে গণ্য করা হতো। তো এর কারণ তালাশ করলাম। আল্লাহ তা'আলা রাস্তা দেখালেন। সে উস্তাদের খিদমতে চিঠি লিখে ক্ষমা চাইলাম এবং সাক্ষাৎ করতে না পারার কারণ লেখলাম। তিনি জবাবে লেখলেন, 'আমার অন্তরে এ ধারণা হয়েছিলো যে, আমাকে ছোট মনে করে হয়তো তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করোনি। কিন্তু তোমার চিঠি দ্বারা জানতে পেরেছি যে, ব্যাপরটা তা ছিলো না।' এর পর দু'আমূলক শব্দ লেখলেন। হযরত মাওলানা বললেন, 'উস্তাদের সম্মান দেখানোর ফলেই আমি তোমাদের সামনে তিরমিযী শরীফ পড়াচ্ছি।'

তাঁর পড়ানোর ধরন এমন ছিলো যে, তৎকালে সবাই একথার ওপর একমত ছিলো যে, এ সময়ে তাঁর থেকে তিরমিযী শরীফের উত্তম পাঠদানকারী পুরো দেশে আর কেউ নেই।

উস্তাদকে কখনো নাখোশ করবে না। যদি তাঁর সাথে কোনো গোস্তাখী ও বেয়াদবী হয়ে যায়, তো তৎক্ষণাৎ একান্ত বিনয় সহকারে ক্ষমা চেয়ে নিবে। যদি উস্তাদের অন্তর মলিন হয়ে যায়, তাহলে ফয়েয হাসিল হবে না।

একবার ইমাম আহমদ রহ. কোনো রোগের কারণে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আলোচনা মধ্যে ইবরাহীম বিন তহমান রহ.র নাম আসলো। তাঁর নাম শোনার সাথে-সাথেই ইমাম আহমদ রহ. সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং বললেন, 'এটা অশোভনীয় যে, বড়দের নাম নেওয়া হবে, আর আমরা হেলান দিয়ে বসে থাকবো।'

তালিবে-ইলমের জন্য এটাও জরুরী যে, উস্তাদের আওলাদ ও তাঁর সংশ্লিষ্টদের তাযীম করবে। 'তা'লীমূল মুতা'আল্লেমীন' কিতাবে লেখা রয়েছে, হিদায়া কিতাবের গ্রন্থকার বোখারা শহরের এক বড় আলেমের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একদিন এমন হয়েছে যে, এ-আলেম দরসে বসা ছিলেন। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আমার উস্তাদের সন্তান বাচ্চাদের সাথে খেলা করছিলো। খেলতে খেলতে যখন মসজিদের দিকে এসেছিলো তো তার তাযীমের জন্য আমি দাঁড়িয়েছি।'

আমার উস্তাদ হযরত মুফতী মাহমুদ সাহেব দা. বা. একবার তার মজলিসে বয়ান করেছেন যে, "হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব রহ.র আহলিয়ায়ে মুহতারামার খিদমতে হাযির হয়ে উঠোনের নিকট দাঁড়িয়ে আরয করলেন, 'আম্মাজী! আপনার জুতোজোড়া আমাকে দিন।' তাঁর জুতো নিয়ে তিনি মাথার ওপর রেখে দীর্ঘক্ষণ কাঁদতে থাকলেন এবং বললেন, 'আমি আমার উস্তাদের হক যথাযথভাবে আ'দায় করতে পারিনি। হয়তো আমার এ আমলটি সে-ত্রুটির তালাফী করবে।"

আল্লামা শা'রানী রহ. বলেন, 'তালিবে-ইলমের আমলের ত্রুটির সত্যিকারের আলামত হলো যে, আমরা তাকে উস্তাদের সামনে বেয়াদব পাবো; উস্তাদের সাথে কথা বলার সময় তার দৃষ্টি নীচু করে, উস্তাদের সামনে তাঁর তাযীম করে না এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখে না, উস্তাদ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ওযীফা বা তাঁর কিয়ামগাহ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। এসব বিষয়ে উস্তাদের আওলাদের সাথে মুকাবিলা করে এবং নিজেকে তাদের

থেকে অধিক হকদার মনে করে। নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বা অন্য কোনো উক্তির কারণে উস্তাদের বক্তব্যকে প্রতিবাদ করে। উস্তাদ থেকে ইলম অর্জন করে তাঁরই সাথে তর্ক-বিতর্ক করে।'

হযরত আলী রাযি. বলেন, 'আমি তাঁর গোলাম, যিনি আমাকে একটি অক্ষর শিখিয়েছেন। তিনি যদি চান আমাকে বিক্রয় করে দিবেন অথবা যদি চান তাহলে আযাদ করে দিবেন বা গোলাম বানিয়ে রাখবেন।' কবি বলেন-

رأيت احق الحق حق المعلم واوجبه حفظا على كل مسلم

لقد حق ان يهدى اليه كرامة لتعليم حرف واحد الف درهم

অর্থ: 'সবচেয়ে বড় হক হলো উস্তাদের হক, যার প্রতি লক্ষ রাখা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। বস্তুতই, যিনি তোমাকে একটি বর্ণ শিখিয়েছেন, তিনি এর হকদার যে, হাযার দিরহাম তার জন্য হাদিয়া পাঠাবে। বরং তাঁর ইহসানের সামনে হাযার দিরহামও মূল্যহীন।'

যে-ব্যক্তি তার উস্তাদের কষ্টের কারণ হবে, সে ইলমের বরকত হতে মাহরূম থাকবে এবং বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইলমের দৌলত দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذاهما لم يكرما

فاصبر لدائك ان جفوت طبيبه و اقنع بجهلك ان جفوت معلما

অর্থ: 'শিক্ষক ও চিকিৎসকের যতোক্ষণ পর্যন্ত সম্মান করা না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা মঙ্গল করবেন না। রোগের চিকিৎসকের সাথে যদি অসদাচরণ করে, তাহলে তার চিরকালই রোগ থাকবে। আর শাগরেদ যদি উস্তাদের সাথে বদ-তমীযী করে তো সে চিরকালই জাহেল থাকবে।'

উস্তাদ যদি কোনো কথা বারবার বলতে থাকেন তাহলেও শুনতে থাকবে, বিরক্ত হবে না। 'তা'লীমুল মুতাআল্লিম'-এ রয়েছে, 'যে-ব্যক্তি হাযার বার শোনার পরও ইলমের সে-মর্যাদা না দেয়, যে-মর্যাদা প্রথমবার দিয়েছিলো, সে-ব্যক্তি 'আহলে ইলম' থেকে নয়।'

সবক ও কিতাবের নির্বাচন নিজের মত দ্বারা করবে না। পূর্বের দিনে তালিবে-ইলমরা নিজের পড়ার ও পড়ানোর বিষয়টা উস্তাদের যিম্মায় রাখতো, যার ফল এ ছিলো যে, তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফল হতো। আর যখনই নিজে নির্বাচন করা শুরু হলো, তখনই ইলম থেকে মাহরূম থাকা শুরু হলো।

ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান রহ. থেকে 'কিতাবুস্‌সালাত' পড়া শুরু করলে তিনি ইমাম বুখারী রহ.কে বললেন, 'তোমার জন্য ইলমে হাদীস পড়া সমীচীন। কারণ, তোমার মধ্যে সে-ইলমের সাথে মুনাসাবাত পাওয়া যাচ্ছে।' ইমাম বুখারী রহ. তাঁর পরামর্শ মেনে নিলেন। সারা দুনিয়া দেখেছে, তিনি হাদীস শাস্ত্রের 'আমীরুল মুমেনীন' হয়েছেন। এতে জানা গেলো যে, তালিবে-ইলমের যে-শাস্ত্রের সাথে মুনাসাবাত রয়েছে, সে ঐ শাস্ত্রের ওপর মেহনত করে অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে নিবে এবং তা প্রচার-প্রসারে লেগে যাবে। এ বিষয়ে নিজের মতেই চলবে না, উস্তাদদের থেকেও পরামর্শ নিবে। কোরআনে পাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমকে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁর থেকে অধিক জ্ঞানী কেউ হতে পারেন না। ফলে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করতেন। এমনকি পারিবারিক বিষয়েও পরামর্শ করতেন।

হযরত আলী রাযি. বলেন, 'পরামর্শ করার পর কেউ ধ্বংস হয়নি।'

এ প্রবাদটি প্রসিদ্ধ যে, মানুষ তিন প্রকার: ১. পূর্ণমানব ২. অর্ধ-মানব ও ৩. অস্তিত্বহীন পর্যায়ের মানব। পূর্ণমানব সে, যে জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও পরামর্শ নেয়। অর্ধ-মানব সে, যে জ্ঞানী; তবে অন্য থেকে পরামর্শ নেয় না। আর অস্তিত্বহীন পর্যায়ের মানব সে, যে জ্ঞানী তো নয়ই; এমনকি অন্য থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করে না।

হযরত সুফ্‌য়ান সওরী রহ.কে হযরত জা'ফর সাদেক রাযি. নসীহত করে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার মু'আমিলায় তাদের সাথে পরামর্শ করো, যাদের অন্তরে আল্লাহর পূর্ণ ভীতি রয়েছে।'

যখন সকল বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন রয়েছে, তো ইলমের বিষয়ে – যা একটি মহান উদ্দেশ্য - পরামর্শ করা অধিকতর প্রয়োজনীয়। আর এ বিষয়ে উস্তাদ হতে সঠিক মত কেউ দিতে পারবে না। আর উস্তাদ ও মাদ্‌রাসা নির্বাচনে যদি কিছুটা বিলম্বও হয়; কিন্তু যখন কাউকে নির্বাচন করে নেওয়া হয় তো যতোক্ষণ পর্যন্ত উস্তাদের মর্জি নয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো মাদরাসা বা অন্য কোনো উস্তাদের নিকট যাবে না। আর উস্তাদের দিয়ানতদারীর তাকাযা হলো, যদি অন্য কারো নিকট পাঠানোর মধ্যে তালেবে-ইলমের ফায়দা হয়, তবে তার মধ্যে খিয়ানত করবে না; তাকে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়ে দিবে।

'তা'লীমুল মুতা'আল্লিম' কিতাবে লেখা রয়েছে, যে তালিবে-ইলম শিক্ষক পরিবর্তন করতে থাকে- আজ এ শিক্ষকের নিকট, কাল ঐ শিক্ষকের নিকট, তো তার ইলমের বরকত শেষ হয়ে যায়।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. লিখেন, 'আমার আব্বাজানের মত হলো যে, (আমাকে) অন্য শিক্ষকের নিকট পড়ার জন্য পাঠানো হবে। আমি যখন জানতে পারলাম তো সারারাত আমার ঘুম আসেনি। খানাও খাইনি। ঘরের ভেতরের লোকেরা যখন এ অবস্থা বললেন, তো আব্বাজান তার মত পরিবর্তন করলেন। আমি পূর্বের উস্তাদের খিদমতেই থেকে গেলাম।' এরপর দুনিয়াবাসী দেখে নিয়েছে, উস্তাদের আযমত ও মুহব্বত কী রঙ সৃষ্টি করে দিয়েছে! ইসলাহে-উম্মতের কত বড় কাজ তাঁর থেকে হয়েছে!

বর্তমানে সচারাচর দেখা যায় যে, তালেবে-ইলম একস্থানে স্থির থাকে না। দাওরায়ে-হাদীস পৌঁছা পর্যন্ত কতো মাদ্‌রাসা ভ্রমণ করে! মূলত ইলম তার উদ্দেশ্য নয় যে, সেটার ক্ষতির চিন্তা হবে। তার উদ্দেশ্য হলো আরাম ও শান্তি। যে মাদ্‌রাসা সম্পর্কে জানতে পারে যে, অমুক মাদ্‌রাসায় অধিক আরামের ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেখানের জন্য সে গাট্টি বাঁধে।

উস্তাদের সন্তুষ্টি হলো তালেবে-ইলমের সফলতার সোপান। তাঁর একটি নেকদৃষ্টি তালেবে-ইলমকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয়!

হযরত মির্জা মাযহার জানে-জানাঁ রহ. ইলমে-হাদীসের সনদ হযরত হাজী মুহাম্মদ আফযল সাহেব থেকে গ্রহণ করেছিলেন। মির্জা মাযহার সাহেব বলেন, 'তাহসীলে ইলম থেকে ফারেগ হওয়ার পর হাজী সাহেব তাঁর টুপি - যা পনেরো বছর পর্যন্ত তাঁর পাগড়ির নিচে ছিলো - আমাকে দান করলেন। রাতের বেলায় গরম পানিতে আমি সে-টুপিটি ভিজিয়ে রাখলাম। সকাল বেলায় সে-পানি অমলতাসের (একপ্রকার দ্রব্য যা জুলাফের কাজে ব্যবহার হয়) পানি থেকেও অধিক কালো হয়ে গিয়েছিলো। আমি সে-পানি পান করে নিলাম। সেটার বরকতে আমার 'দিল ও দেমাগ' এমনভাবে আলোকিত হয়ে গেলো এবং যেহেন এতো তীক্ষ্ণ হয়ে গেলো যে, কোনো জটিল কিতাব আর জটিল থাকেনি।'

যেসর তালেবে-ইলম উস্তাদের টুপি ছুঁড়ে ফেলে, যারা মাদ্‌রাসার ইঁটে ইঁট বাজানোর পরিকল্পনা করে, তারা একটু ভেবে দেখুক যে, উস্তাদের তা'যীমকারীরা কী দৌলত অর্জন করেছে এবং দুনিয়াবাসীদের কী ফয়েয পৌঁছিয়েছে!

অনুমতি ব্যতীত উস্তাদের সাথে কথা বলবে না এবং তাঁর সামনে উঁচু আওয়াযে কথা বলবে না। তাঁর আগে-আগে চলবে না। তাঁর বসার স্থানে বসবে না। তাঁর উদ্দেশ্য জানতে চেষ্টা করবে এবং তদানুসারে আমল করবে। যদি কখনো উস্তাদের তবীয়ত খারাব থাকে, তো তাঁকে কোনোকিছু জিজ্ঞেস করবে না; অন্য

সময়ে জিজ্ঞেস করবে। দরওয়াযায় আওয়ায দিয়ে তাঁকে ডাকবে না। বরং তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষা করবে। (তা'লীমুল মুতা'আল্লিম)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্য হতে আমি আনসারদের নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী ইলম অর্জন করেছি। দ্বি-প্রহরের রৌদ্রে তাঁদের দরওয়াযায় বসে থাকতাম। অথচ যদি চাইতাম, তাহলে তাঁদের অবগত করানোর সাথে-সাথেই তাঁরা বেরিয়ে আসতেন। কিন্তু আমি তাঁদের আরামের প্রতি লক্ষ রাখতাম। তাঁরা বেরিয়ে এলে আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করতাম।'

হযরত মাওলানা ই'যায আলী সাহেব রহ. সম্পর্কে অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো কথা জিজ্ঞেস করার হতো বা কিতাবের কোনো 'মজমূন' বোঝার হতো তো হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.র ঘরের দরওয়াযায় বসে যেতেন। হযরত ঘর থেকে বের হলে তিনি জিজ্ঞেস করে নিতেন। এটা তাঁর দৈনন্দিন বিষয়ের মত ছিলো।

চতুর্থ আদব

উস্তাদের খিদমত

তালেবে-ইলমের জন্য উচিত, তারা উস্তাদের খিদমতকে নিজের জন্য উভয় জাহানের কামিয়াবীর চাবিকাঠি মনে করবে। আমরা 'উস্তাদের আদব' অধ্যায়ে লিখেছি যে, উস্তাদ তালেবে-ইলম থেকে খিদমত নিবেন না। এটাই তাঁর জন্য সমীচীন। কিন্তু তালেবে-ইলম উস্তাদের বলার অপেক্ষায় থাকবে না। নিজেই তাঁর কাজ করে দিবে এবং এটাকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করবে। যে তালেবে-ইলম উস্তাদের খিদমত করে আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্বীন ও দুনিয়ায় উন্নতি দান করেন। এমন তালেবে-ইলমরাই পরবর্তীতে দ্বীনের প্রচার করে, যার দ্বারা পথভোলা হাজারো আল্লাহর বান্দা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। তারা জমীনের মধ্যে তারকার ন্যায় হয়। তাদের সোহবতে এমন আছর রয়েছে যে, বছরের পর বছর পাপকারী মানুষ তাওবা করে আল্লাহর মারেফতের নূর ক্বলবের মধ্যে সৃষ্টি করে নেয়। তাদের দূরদৃষ্টি ও মেধা দ্বারা বড়-বড় জটিল মাসয়ালাও সমাধা হয়ে যায়। তারা উম্মতের জন্য স্তম্ভ স্বরূপ, যার ওপর আসমান ও যমীন ফখর করে। তারা যেখানে কদম রাখে, সেখান থেকে গোমরাহী দূর হয়ে যায় এবং হেদায়াতের রাস্তা খুলে যায়। প্রত্যেকেই একথা ভালোভাবে জানেন যে, যে-ই যা কিছু পেয়েছেন উস্তাদের খিদমত এবং তাঁদের দয়া ও দান দ্বারা পেয়েছেন। দ্বীন ও দুনিয়ার ইয্যত তাঁদেরই দু'আর ফল।

হযরত হাম্মাদ বিন সালামা রহ.র সহোদরা আতিকা বলেন, 'ইমাম আবু হানিফা রহ. আমাদের ঘরের তুলো ধুনতেন। আমাদের জন্য দুধ, তরকারী খরীদ করে আনতেন। এ ধরনের আরো অনেক কাজ করে দিতেন।' হাম্মাদ রহ. হলেন ইমাম আবু হানিফা রহ.র উস্তাদ। সে-সময়ে কি কেউ বুঝতে পেরেছে যে, হাম্মাদ রহ.র ঘরের এ 'খাদেম' একসময়ে পুরো দুনিয়ার 'মখদূম' হবেন?

'তা'লীমুল মুতা'আল্লিম'-এর লেখক লিখেন, ইমাম ফখরুদ্দীনকে আমি মারভে বাদশার নিকট দেখেছি যে বাদশাহ তাঁর অনেক তা'যীম করছেন এবং বারবার বলছেন যে, 'আমি এ বাদশাহী ও ইয্যত শুধুমাত্র উস্তাদের খিদমতের বদৌলতেই পেয়েছি। কারণ, আমি আমার উস্তাদ আবু যায়েদ দব্বুসী রহ.র

অনেক খিদমত করতাম। এমনকি একনাগাড়ে ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি তার খাবার পাক করে দিয়েছি; সেখান থেকে কোনো কিছুই খাইনি।'

এ কিতাবেই আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর ছেলেকে ইলম শিখার জন্য হযরত আছমা'য়ী রহ.র নিকট পাঠিয়েছিলেন। একবার হারুনুর রশীদ সেখানে গেলেন। দেখতে পেলেন, শাহযাদা তাঁকে অযু করাচ্ছে। সে পানি ঢালছিলো আর আছমা'য়ী রহ. নিজ হাতে অঙ্গ ধৌত করছিলেন। হারুনুর রশীদ আছমা'য়ী রহ.কে বললেন, 'আমি আপনার নিকট ইলম ও আদব শিক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছি। আপনি কী আদব শিক্ষা দিচ্ছেন? তাকে এ আদেশ কেন দিচ্ছেন না যে, এক হাতে পানি ঢালবে এবং অন্য হাতে পা ধুইয়ে দিবে?'

একবার হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.র সাহেবযাদা মাওলানা আনযার শাহ কাশ্মিরী রহ. এখানে মাদ্‌রাসায় তাশরীফ রেখেছিলেন এবং তালাবাদের উদ্দেশ্যে তাকরীর করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন।

'এক বাঙালী তালেবে-ইলম ডাভেলে হযরত আব্বাজান রহ.র খিদমত করতেন। মেধায় খুবই দুর্বল ছিলেন। মেহনতও ততোটা করতেন না। সকল তালাবার মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশী দুর্বল ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে অনেক বড় খিদমত নিয়েছেন। এখন তিনি তাঁর এলাকায় শায়খুল ইসলাম। হজ্জের সফরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তিনি বলেছেন, এসব কিছু হযরত শাহ সাহেব রহ.র খিদমতের ফল।'

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সবসময়ে উস্তাদদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, যখনই আমি কোনো নফল বা ফরয নামায পড়তাম, তো উস্তাদদের জন্য অবশ্যই দু'আ করতাম।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.র জীবনীতে লেখা রয়েছে, তাঁর উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ.র এখানে একবার অনেক মেহমানের আগমন ঘটেছিলো। 'বাইতুল-খালা' একটাই ছিলো। মেহমানরা কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। হযরত মাদানী রহ. প্রতি রাতে এসে বাইতুল-খালা পরিষ্কার করে দিয়ে যেতেন। সকাল বেলায় দেখা যেতো যে, 'বাইতুল-খালা' পরিষ্কার।

হযরত মা'ন ইবনে ঈসা রহ. ইমাম মালেক রহ.র শাগরেদ। তিনি তার যমানায় অনেক বড় মুফতী ও মুহাক্কিক ছিলেন। উস্তাদের খিদমতের বদৌলতেই তিনি এ মর্যাদা পেয়েছেন।

হযরত ইমাম মালেক রহ. দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। লাঠি রাখার প্রয়োজন ছিলো। তো লাঠির পরিবর্তে মা'ন ইবনে ঈসা থাকতেন। ইমাম মালেক রহ.র তাঁর কাঁধে ভর করে চলাফেরা করতেন।

আমার (লেখকের) এক সাথী ক্বারী রহীমবখশ সাহেব ক্বারী ফতহে মুহাম্মদ পানিপথী দামাত বারাকাতুহোমের অনেক খিদমত করতেন। মেধাবী ছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট মেহনত করতেন না। দাওরায়ে-হাদীস পর্যন্ত অন্যান তালেবে-ইলমের মত মেহনত করেননি। কিন্তু উস্তাদের খিদমতের ফল এটা হয়েছে যে, এ সময়ে মুলতানের মাদ্‌রাসার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ উস্তাদের মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করছেন এবং কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন।

আমার প্রিয় মওলভী হাফেয সাইয়্যেদ নিয়ামতুল্লাহ পানিপথে পড়ার সময়ে তার উস্তাদদের অনেক খিদমত করতো। তার আত্মীয়-স্বজনের খিদমত থেকেও দূরে থাকতো না। বয়স কম হওয়ার কারণে এবং দিয়ানতদারীর কারণে সে-মহল্লার মহিলাদের বাজার হতে কোনো কিছু আনানোর প্রয়োজন হলে তার মাধ্যমেই আনিয়ে নিতো। সে-খিদমতের বদৌলতেই আজ আল্লাহ তা'আলা তার থেকে দ্বীনের যে খিদমত নিচ্ছেন, বড়-বড় ডিগ্রিধারীরাও তা করতে অক্ষম। এ অধমের (লেখকের) ওপরও আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় মেহেরবানী যে, সবখানেই এ সৌভাগ্য অর্জন করার সুযোগ মিলেছে।

পঞ্চম আদব

দ্বীনি-কিতাবের এহতেরাম

তালেবে-ইলমের জন্য যেমনিভাবে উস্তাদের তা'যীম ও এহতেরাম করা জরুরী, তেমনিভাবে দ্বীনি-কিতাবের আযমতও তার অন্তরে থাকা জরুরী। এর জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখবে।

১. পবিত্রতা ব্যতীত কোনো কিতাব স্পর্শ করবে না।

শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রহ. বলেন, 'আমাদের যে ইলম হাসিল হয়েছে তার মধ্যে এ-ইলমের আযমতের বড় দখল রয়েছে। আমার অবস্থা এরূপ ছিলো যে, কখনো কোনো কিতাব অযু ব্যতীত স্পর্শ করতাম না।'

শামসুল আইম্মা সরখসী রহ.র অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তার বায়ু-গমনের রোগ থাকা সত্ত্বেও অযু ব্যতীত কিতাব হাতে নিতেন না। একবার মুতালা'আ করার সময়ে প্রায় সতেরবার অযু করতে হয়েছে।

এর যৌক্তিক কারণ হলো, মূলত ইলম হলো একটি নূর। আর অযুও নূর। কাজেই ইলমের নূর অযুর নূরের কারণে বেড়ে যাবে।

২. তালেবে-ইলমের জন্য এটাও জরুরী যে, কিতাবের দিকে পা ছড়িয়ে বসবে না। আর তাফসীর, হাদীস ও ফিকহর কিতাবকে অন্যান্য বিষয়ের কিতাবের ওপর রাখবে। আদব সহকারে কিতাব হাতে নিবে। কাউকে দিলে ছুঁড়ে দিবে না। এতে কিতাবের সাথে বেয়াদবী হয়।

৩. কিতাবের ওপর কোনোকিছু রাখবে না।

শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন বলতেন, 'এক ব্যক্তি কিতাবের ওপর দোয়াত রাখতে অভ্যস্ত ছিলো। তো আমাদের শায়খ বললেন, তুমি তোমার ইলম দ্বারা কখনও ফায়দা ওঠাতে পারবে না।'

একবার আমি (লেখক) সাহারানপুর হতে 'মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর'-এর নাযেমে -আ'লা মাওলানা শাহ আস'আদুল্লাহ সাহেব রহ.র সাথে হাকীমুল উম্মত রহ.র খিদমতে থানাভবন যাচ্ছিলাম। গাড়ির ঐ ডাব্বার মধ্যে শায়খুত্তাফসীর মাওলানা ইদরীস কান্ধুলভী রহ.ও ছিলেন। আমি একটি লুঙ্গির মধ্যে কিছু কাপড়

ও কিতাব বেঁধে নিয়েছিলাম। কিতাবগুলো নিচে ছিলো আর কাপড় ছিলো ওপরে। হযরত আমাকে সতর্ক করে বললেন, এরূপ কোরো না।

এক আলেম দু' তালেবে-ইলমকে দু'অবস্থায় পেয়েছেন। একজন হেলান দিয়ে কিতাব মুতালা'আ করছিলো। অপরজন দু'হাটুর ওপর ভর করে কিতাব দেখার মধ্যে লেগেছিলো। আর সাথে-সাথে কিছু লিখছিলো। অভিজ্ঞ উস্তাদ এটা দেখতে পেয়ে প্রথমজন সম্পর্কে বললেন, انه لا يبلغ درجة الفضل 'সে ফযীলতের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না'। আর দ্বিতীয়জন সম্পর্কে বললেন, سيحصل الفضل و يكون له الفضل فى العلم 'অতি শীঘ্রই সে মর্যাদার আসনে আসীন হবে এবং ইলমের মধ্যে তার অনেক বড় মর্যাদা হবে'।

ইমাম হালওয়ানী রহ. বলেন, 'আমরা তা'যীম করার দ্বারাই এ-ইলম অর্জন করেছি। অযুবিহীন অবস্থায় আমরা সাদা কাগজও হাতে নেইনি।'

ইউসুফ বিন হুসাইন রহ. বলেন, 'আদব দ্বারাই ইলম বোঝে আসে এবং ইলম দ্বারা আমল পরিশুদ্ধ হয়। আর আমল দ্বারা হিকমত হাসেল হয়।'

ষষ্ঠ আদব

সহপাঠীদের প্রতি সহমর্মিতা

তালেবে-ইলমের জন্য উচিৎ হলো তার সহপাঠী ও সঙ্গীদের সম্মান দেখানো এবং তাদের হুকুকের প্রতি লক্ষ রাখা। তাদের কোনো প্রকার কষ্ট দিবে না। সাথীদের কেউ যদি অশুদ্ধ ইবারত পড়ে, তবে এতে হাসবে না যে, অজ্ঞতার কারণে সে ভুল ও অশুদ্ধ ইবারত পড়ছে। তোমার হাসির কারণে তার কষ্ট হবে এবং তোমার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হবে। তুমি নিজেকে তার থেকে উত্তম ভাবতে থাকবে। এ উভয়টিই ধ্বংসকারী।'

কোনো সাথীর যদি কিতাব বোঝে না আসে তবে তাকে তাকরারের মাধ্যমে তা' বুঝিয়ে দিবে। তাকে হীন ও ছোট ভাববে না। তিরষ্কারও করবে না। এতে ইনশা-আল্লাহ প্রত্যেক প্রকারের ফায়দা পাওয়া যাবে এবং ইলমের মধ্যে বরকত হবে।

'তা'লীমুল মুতা'আল্লিম' কিতাবে রয়েছে, 'অহংকার সহকারে ইলম হাসিল করা বড়ই মুশকিল ও জটিল।'

العلم حرب للفتى المتعالى كالسيل حرب للمكان العالى

অর্থাৎ 'যেমনিভাবে উঁচু স্থানকে বেগবান স্রোত টুকরো-টুকরো করে দেয় তেমনিভাবে অহংকারী ব্যক্তির ইলমকে তার অহংকার শেষ করে দেয়।'

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, যে-ইলম দ্বারা অহংকার সৃষ্টি হয় সে-ইলম অজ্ঞতা হতেও নিকৃষ্ট।

'রহমাতুল মুতা'আল্লিমীন' কিতাবে একটি ঘটনা লেখা রয়েছে যে, অহংকারের কারণে জনৈক আলেমের দেমাগ অসাড় হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে সে সব ইলম ভুলে গিয়েছিল।

হযরত হুযাইফা রহ. একবার নামাযের ইমামতি করলেন। নামাযশেষে তিনি বললেন, 'ভায়েরা! তোমরা অন্য ইমাম নিয়োগ করো। কারণ, এ-মূহুর্তে আমার মনে এ খেয়াল এসেছে যে, যেহেতু জামা'আতের মধ্যে আমার বরাবর কেউ নেই, তাই আমাকে ইমাম বানানো হয়েছে।'

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, 'মাকারেমে-আখলাক' হলো দশটি বিষয়;

১. সত্য কথা বলা।
২.লোকদের সাথে সঠিকভাবে লেন-দেন করা। অর্থাৎ ধোঁকা না দেওয়া।
৩. ভিক্ষুককে দান করা।
৪. অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া।
৫. ছেলায়ে-রেহমী করা।
৬.আমানতের হিফাযত করা।
৭. রুযীর হক আদায় করা।
৮. সাথীদের হক আদায় করা।
৯. মেহমানের হক আদায় করা।
১০. আর এসব কিছুর মূল হলো 'হায়া'।

কামরার সাথীদের প্রতিও যথেষ্ট খেয়াল রাখবে। তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। তাদের থেকে কোনো ত্রুটি বা ক্ষতি হয়ে গেলে বরদাশ্‌ত করে নিবে। তাদের মধ্যে যারা গরীব তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাগুলো সামনে রাখবে যে, তাদের মধ্যে কী পরিমান 'ঈসার ও হামদর্দী' ছিলো।

এক যুদ্ধে জনৈক সাহাবীর চাচাতো ভাই অনেক যখম হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। এ-সাহাবী তার তালাশে বের হলেন। দেখতে পেলেন, এক জায়গায় তিনি পড়ে রয়েছেন। প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। পানি চাইলেন। তিনি পানি নিয়ে গেলেন। নিকটেই আরেক ব্যক্তি পড়ে ছিলেন। তিনিও পানি চাচ্ছিলেন। তার ভাই ইশারা দিলেন যে, আগে তাকে পান করাও। তার নিকট গেলে সেখানে যখমী হয়ে পড়ে-থাকা তৃতীয় আরেকজন পানি চাইলেন। সে-দ্বিতীয় সাহাবী ইঙ্গিত করলেন যে, আগে তাকে পানি পান করাও। যখন পান করাতে গেলেন তো দেখলেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। দ্বিতীয়জনের নিকট এসে দেখতে পেলেন যে, তাঁরও ইনতিকাল হয়ে গেছে। যখন তাঁর ভায়ের নিকট আসলেন তো দেখতে পেলেন যে, তিনিও বেঁচে নেই। এটাই হলো ঈসার যে, অপরের হামদর্দীর জন্য সকলেই পিপাসার্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

শায়খুল হাদীস দা.বা. এ-ঘটনাটি লিখেছেন যে, জনৈক সাহাবী একটি বকরীর মাথা তার এক সাথীর জন্য পাঠিয়েছেন। যদিও তাঁর প্রয়োজন ছিলো; কিন্তু ভাবলেন যে, আমার থেকে আমার সাথী অধিক হকদার। তাই তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তৃতীয়জনের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে প্রত্যেকেই অপরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত সাত ঘর ঘুরে তা সে-প্রথম সাহাবীর ঘরে এসে পৌঁছল, যিনি তা শুরু করেছিলেন।

সাহবায়ে কিরামের এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যাবে যে, নিজেরা উপোস থেকে অপরকে খাইয়েছেন।

হযরত মাওলানা আবুল হাসান মিয়াঁ সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি নিজের প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে অপরের সাহায্য করতেন।

একবার আমাদের (লেখকের) এলাকায় তিনি তাশরীফ আনলেন। নিকটের বস্তি হতে এক বৃদ্ধ এসে তার প্রয়োজনের কথা বললেন। মাওলানার নিকট তখন কিছুই ছিলো না। তিনি তাঁর ভাতিজা রাবে' সাহেব থেকে টাকা নিয়ে তাকে দিলেন। পরিমাণ কী ছিলো তা জানা নেই।

মাযাহেরুল উলূম অবস্থানকালে হযরত মাওলানা আলহাজ্জ আস'আদুল্লাহ সাহেব ও হযরত শায়খুল হাদীস সাহেবকে অনেকবার দেখেছি যে, কোনোকিছু আসার সাথে-সাথেই তাঁরা তা অন্যের খিদমতে পাঠিয়ে দিতেন।

হযরত মাওলানা শাহ ওছীউল্লাহ নাওয়্যারাল্লাহু মারকাদাহুর এরূপ অনেক ঘটনা রয়েছে যে, তিনি অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েছেন। অনেক আলেম, তালেবে-ইলম ও গরীবের জন্য তিনি ওযীফা নির্ধারিত করে রেখেছিলেন।

আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেব দা. বা. কানপুরে যখন অবস্থান করছিলেন, তো আমি যখনই সেখানে হাযের হতাম, সেখানে এ ধরনের অনেক নমুনা দেখতে পেতাম। বড়-বড় অংকের টাকা দিয়ে তিনি অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। পরিধান করার পোশাক এবং নিজের কিতাব দিতেও তিনি ইতস্ত করতেন না। এ-'ঈসারও হামদর্দী' এখনও বন্ধ হয়নি। আর তাঁর নিজের অবস্থা এরূপ যে, যা কিছু মিলে গেলো খেয়ে নিলেন। আর যা কিছু পাওয়া গেলো পরে নিলেন।

اولئك آبائى فجئنى بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع

'এরাই হলেন আমার আকাবির; কে পারবে তাদের সমতূল্য উপমা পেশ করতে?'

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন! -আমীন!

সপ্তম আদব

ইলম অর্জনে মেহনত করা

তালেবে-ইলমের জন্য আবশ্যক যে, তারা ভালোভাবে মেহনত করবে। নিজের সময় বিনষ্ট করবে না। ইলম অর্জনে কোনো প্রকার অলসতা করবে না। কারণ, অলসতা হলো ইলম হতে মাহরূম থাকার কারণ।

সলফদের জীবনের ওপর ভাববে যে, তাঁরা কত মেহনত করেছেন! কোরআনে-পাকের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে-

و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

'যারা আমাদের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে, তো অবশ্যই আমরা তাদের সঠিক পথ দেখাবো।'

অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে-

يا يحيى خذ الكتاب بقوة

'হে ইয়াহইয়া! কিতাব মযবুতভাবে ধরো!'

আরবী প্রবাদ রয়েছে-

من طلب شيئا و جد وجد

'যে-ব্যক্তি কোনো কিছু আকাঙ্খী হয় এবং তার জন্য চেষ্টা করে, সে সেটা পায়।'

من قرع الباب و لج ولج

'যে-ব্যক্তি দরওয়াযায় খটখটালো এবং গুরুত্ব দিলো, সে অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করলো।'

ইমাম শাফে'য়ী রহ. বলেন-

الجد يدنى كل امر شاسع و الجد يفتح كل باب مغلق

'চেষ্টা করে মানুষ সকল মুশকিল কাজ সমাধা করতে পারে, যেমনিভাবে চেষ্টা করার পর বদ্ধ দরওয়াযা খুলে যায়।'

জনৈক কবি বলেন,-

تمنيت ان تمسى فقيها مناظرا بغير عنان و الجنون فنون

و ليس اكتساب مال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون

'কষ্ট স্বীকার করা ছাড়া যদি তোমার জ্ঞানী, ফকীহ ও মুনাযির হওয়ার ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে জেনে রেখো, এটা পাগলামী। কারণ, যখন টাকা-পয়সা কষ্ট ছাড়া অর্জিত হয় না তো ইলম – যা মাল হতে অনেক ঊর্ধ্বের – তা কী করে কষ্ট ছাড়া অর্জিত হবে?'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন,

العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك

'ইলম তোমাকে তার একটি অংশও দিবে না যদি না তুমি তোমার পুরোটা তাকে দাও।'

শায়খুল ইসলাম আনসারী রহ. বলেন-

هذا الشان شان من ليس له شان سوى هذا الشان

'ইলম তলব করা সে-সব হিম্মতওয়ালাদের কাজ, যাদের এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ.কে বলেছেন, 'তুমি খুবই দুর্বল মেধার ছিলে। কিন্তু তোমার প্রচেষ্টা তোমাকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছে।'

'বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন' কিতাবে ইমাম ত্বাহাবী রহ. সম্পর্কে লেখা রয়েছে, তাঁর মামা ইমাম মুযনী রহ. তাঁকে দুর্বল-মেধা হওয়ার লজ্জা দিয়ে বলেছিলেন, 'খোদার কসম! তোমাকে দিয়ে কোনো কিছুই হবে না।' ইমাম ত্বাহাবী রহ. আবু জা'ফর ইবনে আবী ইমরান হানাফীর দরসে শরীক হয়ে গেলেন এবং অনেক মেহনত করে ইলম অর্জন করলেন। ফিকহর মধ্যে বড়ই যোগ্যতা অর্জন করলেন। এরপর দুনিয়া এ দুর্বল-মেধাকে ইমাম মেনে নিলো। মেহনতের ফল এরূপই হয়।

মেহনত সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলোর লক্ষ রাখবে।

১. মুতালা'আ

এ ছাড়া কোনো যোগ্যতা অর্জন হয় না। কেহই এ ছাড়া উন্নতি করতে পারেনি।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. সম্পর্কে রয়েছে, তালেবে-ইলমীর পরও তিনি কিতাব মুতালাআ'র মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন।

তাঁর খাস শাগরেদ মুহাম্মদ বিন সামা'আ রহ. বলেন, 'ইমাম মুহাম্মদ রহ. মুতালাআ'র মধ্যে এতো নিমগ্ন থাকতেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি সালাম করতো তো নিমগ্নতা ও বে-খবরীর কারণে জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে তার জন্য দু'আ করতেন।'

তাঁর পৌত্র বলেন, 'ইমাম মুহাম্মদ রহ.র মৃত্যুর পর আমি আমার আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, নানাজান ঘরে থাকাকালে কী কী করতেন? তিনি ইশারা করে বলেছেন, এ কক্ষে থাকতেন। আশে-পাশে কিতাবের স্তুপ লেগে থাকতো। মুতালা'আর সময়ে আমি তাঁকে কথা বলতে দেখিনি।'

ইলম চর্চায় তার মনোযোগের অবস্থা এমন ছিলো যে, কাপড় ময়লা হয়ে গেলেও সেটার খেয়াল থাকতো না। অন্য কেউ যদি বলে কাপড় না বদলিয়ে দিতো তাহলে কাপড় বদলাতেন না। ঘরের মোরগ এ কারণে জবাই করে দিয়েছেন যে, সেটার আওয়াযের কারণে মুতালা'আর ক্ষতি হয়। তিনি একথা বলে রেখেছিলেন, 'মুতালা'আর সময়ে আমার নিকট কোনো প্রয়োজনের কথা বলবে না। আমার ক্বলব সেদিকে ধাবিত হয়।'

ইমাম শাফে'য়ী রহ. বলেন, 'একবার আমি পুরো একটি রাত ইমাম মুহাম্মদ রহ.র নিকট থেকেছি। তাঁর সারা রাত এভাবে কেটেছে যে, কিছুক্ষণ মুতালা'আ করতেন। আবার শুয়ে পড়তেন। আবার উঠে মুতালা'আয় লেগে যেতেন। সকাল হলে তিনি ফজরের নামায পড়লেন।' এতে বোঝা যায় যে, তিনি সারারাত জাগ্রত ও বা-অযু ছিলেন।

কিতাবে লেখা রয়েছে, ইমাম মুহাম্মদ রহ. রাতে খুবই কম ঘুমোতেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি দরস-তাদরীস ও মুতালা'আয় কাটিয়ে দিতেন।

তাঁর এক বন্ধু তাঁকে কম ঘুমানোর ও কষ্ট স্বীকার করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন-

كيف انام و قد نامت عيون المسلمين توكلا علينا يقولون اذا وقع لنا امر رفعناه اليه فيكشفه لنا فاذا نمت ففيه تضييع الدين

'সবাই নিশ্চিতে ঘুমোয় যে, যদি মাসয়ালা পেশ আসে, তো আমরা গিয়ে তাঁর (ইমাম মুহাম্মদ রহ.) থেকে জেনে নেবো। এখন যদি আমিও ঘুমিয়ে পড়ি এবং দ্বীনী কিতাব মুতালা'আ না করি, তো এতে দ্বীন ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

হযরত মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লী রহ. একদিন কামরার মধ্যে মুতালা'আ করছিলেন। মুতালা'আর ফাঁকে তিনি পানি চাইলেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম রহ. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চিন্তা হলো,

মুতালা'আর মধ্যে মন অন্যদিকে কীভাবে গেলো? মনে হচ্ছে, একে দিয়ে পড়ালেখা হবে না।। হুকুম দিলেন, 'পানির পরিবর্তে তাকে (কেরোসিন) তেল দেওয়া হোক,'- যা সেখানে রাখা ছিলো। মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব রহ. গ্লাস মুখে নিয়ে তেল পান করে নিলেন। কিন্তু এটা অনুভব করতে পারেননি যে, তা তেল ছিলো না পানি। এরপর মুতালা'আয় মগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁর পিতার শংকা দূর হলো। বললেন, আশা রাখি, 'সে পড়বে।' তাঁর পিতা যেহেতু অনেক বড় চিকিৎসক ছিলেন, তাই সাহেবযাদাকে ঔষধ পান করিয়ে তেলের কার্যকারিতা দূর করে দিয়েছেন।

হাকীমুল উম্মত রহ.র একটি ওয়াযে রয়েছে, দিল্লীর এক তালেবে-ইলম ছিলো। নিতান্তই গরীব ছিলো সে। মুতালা'আর জন্য তেল না থাকার কারণে পেরেশান ছিলো। এক দোকানদারকে বললো, যদি আমার জন্য রাতের তেলের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমি তোমার দোকান রাতভর পাহারা দেবো। দোকানদার আনন্দিত হলো যে, এতো কম পারিশ্রমিকে লোক পেয়ে গেছি। আর তালেবে-ইলমও খুশী হলো যে, আমার জন্য মুতালা'আর ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

একরাত এ তালেবে-ইলম মুতালা'আ করছিলো। এ সময়ে বাদশাহর সওয়ারী অনেক বড় লশ্‌কর নিয়ে গান-বাজনা করতে করতে তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করে গেলো। তাদের দেখার জন্য শহর এবং তার আশপাশ অনেক লোকের সমাগম হলো। সওয়ারী চলে যাওয়ার পর কিছু লোক - যারা সে জশন দেখার জন্য এসেছিলো - এ তালেবে-ইলমের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাদশাহর সওয়ারী কি চলে গেছে? তালেবে-ইলম জবাব দিল, 'আমার জানা নেই। তবে একটি শোরগোল শুনেছিলাম।'

আমি (লেখক) যখন মাযাহেরুল উলূম মাদ্‌রাসায় পড়ছিলাম, তখন হযরত মাওলানা আলহাজ্জ আস'আদুল্লাহ সাহেব দা.বা.-এর পরিবারে একটি সন্তান জন্ম হলো। হযরত বললেন, 'শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.কে অবগত করাও এবং বলো যে, যদি কষ্ট না হয়, তাহলে হযরত তাশরীফ এনে দু'আ করবেন এবং কানে আযান দিবেন।' আমি আরয করলাম, 'এখন রাত দুটো। হযরত এ সময়ে আরাম করে থাকবেন।' বললেন, 'না, তিনি মুতালা'আর মধ্যে থাকবেন।' আমি গিয়ে দেখলাম, বাস্তবেই হযতর মুতালা'আ করছেন। তিনি তখনই তাশরীফ আনলেন।

আমি নিজেই হযরত নাযেম সাহেব, হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব কামেলপুরী, হযরত মাওলানা আব্দুশ শাকুর সাহেব, হযরত মুফতী আলহাজ্জ মাহমূদ হাসান সাহেব, হযরত মাওলানা আমীর সাহেব এবং অন্যান্য

আসাতিযায়ে কিরামকে অনেক বেশী মুতালা'আ করতে দেখেছি। কিতাব মুতালা'আ না করে কেউ পড়াতেন না - যদিও সে-কিতাব কয়েকবার পড়িয়ে থাকেন।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, মাযাহেরুল উলূমের সদরে মুফতী, মুফতী সা'য়ীদ আহমাদ সাহেব বলেন, 'জালালাইন শরীফ বিশ বছরেরও বেশী পড়িয়েছি। কিন্তু এখনও মুতালা'আ ছাড়া পড়াই না। আর প্রত্যেকবারের মুতালা'আর মধ্যে একটি নতুন স্বাদ পাওয়া যায়।'

আজকাল তালেবে-ইলম ও উস্তাদের মধ্যে মুতালা'আর প্রতি আশ্চর্য রকম অনীহা দেখা যাচ্ছে। কেহই মুতালা'আর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। যদি কিছুটা আগ্রহ হয়, তবে সেটা হলো গায়রে-দরসী কিতাব ও পত্র-পত্রিকা পড়ার ক্ষেত্রে। আর ইতিহাস সম্পর্কিত ও রাজনীতি সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা জানতে পারলে অনেক আনন্দিত হয়। সর্বনাশের কথা হলো, দরসের সময়ও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে। পুরো সময় এর পিছনে বিনষ্ট করে দেয়। এভাবে না উস্তাদের কোনো কিছু অনুভব হয়, আর না তালেবে-ইলমের। অথচ এটা দিয়ানতদারীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এ অধম (লেখক) আমার উস্তাদ হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. থেকে শুনেছি যে, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব রহ. সবকের মধ্যে বাইরের কোনো কথা বলতেন না। সবকের পরেও যদি বাইরের কোনো ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে কথা বলতে চাইতো, তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে কথা বলতেন। বলতেন, 'মাদ্‌রাসার কার্পেটের ওপর শুধুমাত্র মাদ্‌রাসার কাজের সময়ে বসা উচিত।'

তালেবে-ইলমের জন্য উচিত হলো প্রত্যেকটি সবকই মুতালা'আ করে পড়া। এর জন্য রাতের সময়টাই অধিক উপযোগী। আসাতেযাগণ বলেছেন, 'যে তালেবে-ইলম দিনে তাকরার করার ও রাতে মুতালা'আ করার প্রতি গুরুত্ব দিবে, সে ইলমের মধ্যে তারাক্কী করতে পারবে।'

হযরত মাওলানা ক্বারী আব্দুর রহমান সাহেব, মুহাদ্দিসে পানিপথী রহ.র জীবনীতে রয়েছে, তিনি প্রাথমিক কিতাবগুলো তাঁর পিতার নিকট পড়েছেন। একদিন ভালোভাবে মুতালা'আ করতে পারেননি। তাই তাঁর আব্বাজান তাঁকে সবক পড়াননি। হযরত ক্বারী সাহেব রহ. বলেন, 'এতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। এমনকি আমি রাতের খাবারও খেতে পারিনি। এরপর থেকে কখনো সবকের মধ্যে নাগাহ হয়নি।'

'তা'লীমুল মুতা'আল্লিম' কিতাবে রয়েছে, 'যে-ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে চায় তার জন্য উচিত হলো রাতের সময়টা ইলমী শোগলের মধ্যে খরচ করা।' জনৈক কবি বলেন-

بقدر الكد تكتسب المعالى　　من طلب العلى سهر الليالى

تروم العز ثم تنام ليلا　　يغوص البحر من طلب اللآلى

علو الكعب بالهمم العوالى　　وعز المرء فى سهر الليالى

ومن رام العلى من غير كد　　اضاع العمر فى طلب المحالى

'তুমি তোমার প্রচেষ্টা অনুযায়ী উঁচু মাকামে পৌঁছবে। যে-ই উঁচু মাকামে পৌঁছার আকাঙ্খী হয়, তার উচিত রাত্রি জাগরণ করা। তুমি সম্মান ও উঁচু মর্যাদা চাও আর পুরো রাত ঘুমে কাটিয়ে দাও। একথা কি জানা নেই যে, যে-ব্যক্তি মোতির তালাশ করে সে দরিয়ার মধ্যে ডুবোয়? তাহলে ইলম এতো সহজে কী করে হাসিল করা যেতে পারে? উঁচু আযীমতের পরই মানুষ উঁচু মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। কাজেই রাত্রি-জাগরণ মানুষের ইয্যতের কারণ হবে। আর কেউ যদি একথা ভেবে থাকে যে, কোনো কষ্ট স্বীকার করা ছাড়াই উঁচু মর্যাদা অর্জন করবে, তবে তা একটা অসম্ভব বিষয়, যার পিছনে সে তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।'

হাকীম জালিনুসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'আপনি আপনার সাথীদের থেকে অধিক হিকমত কীভাবে অর্জন করেছেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'কিতাব পড়ার জন্য চেরাগের মধ্যে তার চেয়েও বেশী খরচ করেছি, যতটুকু লোকেরা শরাবের জন্য খরচ করে।'

তালেবে-ইলমী যমানায় যদি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহলে তা শেষ-জীবন পর্যন্ত বহাল থাকে। আর যদি এ সময়ে অনীহা সৃষ্টি হয় এবং কিতাবের সাথে মুনাসাবাত সৃষ্টি না হয় তাহলে পরবর্তীতে কিতাবের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া বড়ই কঠিন বিষয়। বরং মাদ্‌রাসার যিন্দেগী এবং তা'লীমী পেশা গ্রহণ করাও হয়তো পছন্দ করবে না। এ কারণেই আজকাল তালেবে-ইলমের সংখ্যা অনেক। কিন্তু মুদার্‌রিস পাওয়া যায় না। এর বড় কারণ হলো, ইলম থেকে অনীহ হওয়া। নচেৎ এটা অসম্ভব যে, দশ-বারো বছর ইলমের সাথে সম্পৃক্ত থেকেও নিজের জন্য অন্য কিছুর সিদ্ধান্ত নিবে।

আল্লামা ইবনুল জওযী রহ.র জীবনীতে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী দা. বা. লিখেন, তিনি (ইবনুল জওযী রহ.) তাঁর সাহেবযাদাকে তাঁর হালাত বর্ণনা

করতে গিয়ে বলেন, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে, ছয় বৎসর বয়সে আমি মকতবে গিয়েছি। কখনো রাস্তা-ঘাটে বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করিনি বা উচ্চ স্বরে হাসাহাসিও করিনি। সাত বছর বয়সে জামে' মসজিদের সামনে দিয়ে যেতাম। সেখানে কোনো কিছুর প্রদর্শনী বা যাদু ইত্যাদি দেখার জন্য না দাঁড়িয়ে মুহাদ্দিসের দরসে-হাদীসে হাযির হতাম। তিনি হাদীস ও সীরতের যে আলোচনা করতেন তা যবানী ইয়াদ হয়ে যেতো। তারপর বাড়ি গিয়ে তা লিখে নিতাম। অন্যান্য ছেলেরা দজলার পাড়ে খেলাধুলো করতো। আমি কোনো কিতাবের পাতা নিয়ে একদিকে চলে যেতাম। আলাদা নিরিবিলিতে বসে মুতালা'আয় লেগে যেতাম।'

সামনে গিয়ে তিনি লিখেন, তাঁর প্রিয় কাজ ছিলো কিতাব মুতালা'আ করা। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের কিতাব পড়তেন এবং অতৃপ্ত থেকে যেতেন।

'ছইদুল খাতির' কিতাবে মুতালা'আ ও কুতুব-বীনী সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম যুহরী রহ.র কিতাব মুতালা'আর অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তাঁর চারিদিকে কিতাবের স্তুপ থাকতো। আর মুতালা'আর মধ্যে তিনি এতোটাই নিমগ্ন থাকতেন যে, দুনিয়ার কোনো খবরই তাঁর থাকতো না। স্ত্রীরা কখন একথা সহ্য করতে পারে যে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে এতো বেশী সময় দেওয়া যাক? একদিন তাঁর স্ত্রী মনের দুঃখে বলেই ফেললেন, 'এ কিতাবগুলো আমার জন্য তিন সতীন থেকেও বেশী ভারী।'

ইমাম শাফে'য়ী রহ.র একজন বিশেষ শাগরেদ ইমাম মুযনী রহ. তাঁর উস্তাদের একটি কিতাব পঞ্চাশ বছরেরও অধিক মুতালা'আ করেছেন। তিনি নিজেই বলছেন, 'প্রত্যেকবারের মুতালা'আয় আমি নতুন নতুন ফায়দা পেয়েছি।'

আবুল আব্বাস সা'লাব বাগদাদে ইসহাক মুছেলীর কুতুবখানায় লোগাতের একটি কিতাব দেখেছিলেন, যা ছিলো এক হাযার খন্ড-বিশিষ্ট। এর সবগুলোই ইসহাক শ্রবণ (سماع) করেছিলেন।

ইমাম রাযী রহ.র আফসোস ছিলো, খাওয়ার সময়টা কেন ইলম চর্চা হতে খালি থাকে? তিনি বলতেন-

و الله انى اتأسف فى الفوات عن الاشتغال بالعلم فى وقت الاكل فان الوقت و الزمان عزيز

'খোদার কসম! খাওয়ার সময়টা ইলমী শোগল হতে খালি যাওয়ার কারণে আমার আফসোস হয়। কারণ, ফুরসতের সময় খুবই কম পাওয়া যায়।'

আবু বকর ইবনে বাশ্‌শার বাগদাদে আদবের মশহুর ইমাম ছিলেন। শাহযাদাদের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। একদিন কসরে-খিলাফতে যাওয়ার সময়ে দাস-দাসী বিক্রয়ের বাজারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে-সময়ে সেখানে একটি দাসী বিক্রয়ের জন্য আনা হয়েছিলো। তার সৌন্দর্য ও গুণাবলী সারা বোগদাদে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ইবনে বাশ্‌শার তাকে দেখে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কসরে-খিলাফতে পৌঁছলে খলীফা তাঁকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি দাসীর কথা বললেন। একথা শুনে খলীফা গোপনে খাদেমদের নির্দেশ দিলেন, 'সে-দাসীকে ক্রয় করে ইবনে বাশ্‌শারের ঘরে তাঁর পৌঁছার আগেই পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক।' ইবনে বাশ্‌শার ঘরে পৌঁছে দাসীকে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করে সব জানতে পেরে দাসীকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে সেখানে বসেই একটি ইলমী মাসয়ালা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতে লাগলেন। তবীয়ত তো আরেক দিকে লেগে ছিলো, যার ফলে চিন্তা-ফিকিরে ত্রুটি হচ্ছিলো। অন্তরের এ অবস্থা দেখে ইবনে বাশ্‌শার খাদেমকে ডেকে বললেন, এ দাসীকে নিয়ে ফিরত দিয়ে এসো। আমার নিকট তার এ পরিমাণ কদর নেই যে, সে আমার দিলকে ইলম থেকে ফিরিয়ে রাখবে। খাদেম গিয়ে দাসীকে ফেরত দিয়ে এলো।

ইমাম শাফে'য়ী রহ.কে যারা দেখেছেন তাদের বর্ণনা, 'দিন তো দিন ছিলো; রাতেও ইমাম শাফে'য়ী রহ.র অবস্থা এরূপ ছিলো যে, বাহ্যত ঘুমন্ত ব্যক্তির মত পড়ে থাকতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর দাসীকে নির্দেশ দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে কিছু লিখে রাখতেন। এরপর বাতি নিভিয়ে দিতেন।'

মাওলানা গিলানী মুফতী রুকনুদ্দীনের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মামা মাওলানা আনওয়ারুল্লাহ খান সাহেবের মুতালা'আর অবস্থা তাঁর ভাষা লিখেন, 'আমরা চেষ্টা করতাম যে, কিতাবের মর্ম মুতালা'আ দ্বারাই 'হল' হয়ে যাবে। এর পদ্ধতি এরূপ ছিলো যে, ইবারত ও তরজমার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হতো। নতুন যে-সকল শব্দ আসতো সেগুলোকে লোগাত দ্বারা 'হল' করা হতো। এরপর মতলব বোঝার চেষ্টা হতো। যদি এক বারে 'মজমুন' আয়ত্ব না হতো, তো দু'বার, তিনবার চেষ্টা করা হতো। এরপরও যদি কোনো কিছু থেকে যেতো, তো উস্তাদ হযরত মাওলানা ফিরিঙ্গী মহল্লীর দরসে 'হল' হয়ে যেতো। উস্তাদ থেকে যখন মতলব জানা হয়ে যেতো আনন্দের আতিশয্যে এমন মনে হতো যে, কোথাও থেকে যেনো মুল্যবান খাযানা মিলে গেছে। এভাবে মুতালা'আ করার ফল এ হয়েছে যে, প্রত্যেকদিন কয়েক পৃষ্ঠার দরস হয়ে যেতো।'

আজকাল তালেবে-ইলমদের খানা-পিনা পাকানো থেকেই ফুরসৎ পাওয়া যায় না। এভাবে মনোযোগ সহকারে কে মুতালা'আ করবে? শায়খ মুহাদ্দিসে

দেহলভী রহ. স্বীয় তালেবে-ইলমীর অবস্থা বর্ণনা করে লিখেন-

'বেশী মুতালা'আ করার কারণে আব্বাজানের দয়ার উদ্রেক হতো। তিনি বলতেন, কতক্ষণ পর্যন্ত আর জেগে থাকবে! গিয়ে আরাম করো।'

শায়খ বলেন, 'আব্বাজানের কথা শোনার সাথে-সাথে শোয়ে পড়তাম। আব্বাজান যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, তো আবার উঠে গিয়ে মুতালা'আয় লেগে যেতাম।'

এ মেহনতই তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বানিয়েছে।

কুতবুল আলম মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব রহ.র জীবনীতে রয়েছে- মুতালা'আর প্রতি তিনি এতোবেশী মনোযোগী থাকতেন যে, তাঁর পাশে রাখা খাবার অন্য কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেলেও তিনি টের পেতেন না।

এ মেহনতের ফল এ হয়েছে যে, তালেবে-ইলমী যিন্দিগীতেই তিনি বড়-বড় কিতাবের সবক পড়িয়েছেন।

মাজাহেরুল উলূমের নাযিমে-আ'লা আলহাজ্জ শাহ আস'আসদুল্লাহ সাহেব বলেছেন, ফারেগ হওয়ার পরও আমার দৈনন্দিন মুতালা'আর গড় ছিলো এক হাযার পৃষ্ঠা।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব মু. জি. দীর্ঘদিন যাবৎ শুধুমাত্র দুপুরের খাবার খেতেন; রাতে খেতেন না। অধম কয়েকবারই হযরত হতে শুনেছি, 'আমার এক সদয় সহোদোরা ছিলো। আমি সন্ধ্যায় মুতালা'আয় থাকতাম আর সে আমার মুখে লোকমা তুলে দিতো। এভাবে মুতালা'আয় কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু যখন সে মারা গেলো তো এখন আর কেউ আমার মান-গুমান সহ্য করার মতো নেই। আর কিতাব মুতালা'আর ক্ষতিও আমার জন্য সহনীয় নয়। তাই রাতের খাবার আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

শায়খুত্তাফসীর হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ. মাযাহেরুল উলূম পড়ার সময়ে ক্বলবের (হার্টের) ব্যথার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক সময়ে বেঁহুশ হয়ে যেতেন। মাযাহেরুল উলূমে এখনও উস্তাদগণ অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। অধম (লেখক) প্রায় প্রত্যেক বছরই যাই। সেখানকার উস্তাদদের যিন্দেগী ঈর্ষণীয়।

শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ই'যায আলী সাহেব রহ.র কুতুব-বীনীর প্রতি এক আসক্ত ছিলেন যে, অসুস্থতার সময়েও তাঁর শিয়রে কিতাব রাখা থাকতো। বলতেন, 'আমার অসুস্থতার চিকিৎসাই হলো কুতুব-বীনী।' তিনি তাঁর এ

আসক্তির কথা আরবী কবিতা আকারে প্রকাশ করেছেন। 'নফহাতুল আরব' তার রচিত আদবের কিতাব। সেখানে সে-কবিতা উল্লেখ রয়েছে।

হযরত মাওলানা ওছীউল্লাহ সাহেবের মুতালা'আর প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিলো। তাঁর জনৈক খাদেম থেকে শুনেছি, 'কিতাব দেখতে দেখতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। জাগ্রত হলে আবার কিতাব মুতালা'আ শুরু করতেন। ভাসা-ভাসাভাবে মুতালা'আ করতেন না। বরং গভীরভাবে মুতালা'আ করতেন। তালেবে-ইলমী যিন্দেগীতে অনেক কিতাব তাঁর যবানী ইয়াদ ছিলো।'

হযরত আল্লামা সিদ্দীক আহমদ সাহেব কাশ্মিরী রহ. তাঁর তালেবে-ইলমীর যমানায় শুধুমাত্র রুটি নিতেন; তরকারী নিতেন না। পকেটের মধ্যে রুটি রেখে দিতেন। সুযোগ হলে খেয়ে নিতেন। তরকারীসহ রুটি খাওয়ার মধ্যে মুতালা'আর ক্ষতি হতো।

মাওলানা মিনহাজ উঁচুমানের আলেম ছিলেন। হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহী রহ.ও তাঁর ওয়াযে বসতেন। তিনি ইলম হাসেল করার জন্য লাহোর হতে দিল্লীতে এসেছিলেন। বহু কষ্ট স্বীকার করে ইলমের দৌলত অর্জন করেছিলেন। তাঁর ঘটনার মধ্যে লেখা রয়েছে, তালেবে-ইলমীর যমানায় তিনি দোকান থেকে সামান্য আটা ও ঘি আনতেন। আটা দিয়ে চেরাগ বানিয়ে তার মধ্যে ঘি ঢেলে দিতেন। আর সেটার আলোতেই সারারাত মুতালা'আয় মশগুল থাকতেন। দিনের বেলায় সেটার রুটি পাকিয়ে খেয়ে নিতেন এবং এর ওপরই তুষ্ট থাকতেন। পরবর্তীতে সুলতান বহুলূল লোদীর রাজত্বকালে তিনি দিল্লীর মুফতী নিয়োগ হয়েছিলেন।

হযরত মাওলানা নো'মানী দা. বা. একখানে লিখেন, 'আমি যখন আযমগড় জেলায় পড়তাম, তো সেখানে কিছু সাথী মিলেছিলো, যাদের মুতালা'আ করার আগ্রহ ছিলো। অনেক সময় এমন হতো যে, আমরা রাত দু'টা-তিনটা পর্যন্ত মুতালা'আ ও মুযাকারার মধ্যে মশগুল থাকতাম। এ মগ্নতার মধ্যে দিনও কাটিয়ে দিতাম।'

একবার তিনি বলেন, 'পরীক্ষার সময়ে সকল কিতাব যবানী ইয়াদ থাকতো। সে-মেহনতের ফল এ হয়েছে যে, দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষায় কয়েকটি সওয়ালের জওয়াবে পূর্ণ একটি পুস্তিকাই লিখে ফেলেছি।' তিনি বলেন, 'মুহতামিম সাহেব থেকে আমি অনুমতি নিয়ে নিয়েছি যে, জওয়াবের জন্য যে পরিমাণ সময় মাদ্‌রাসা থেকে নির্ধারিত রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। আমাকে আরও বেশী সময় দেওয়া হোক।' মুহতামিম সাহেব একজন নেগরান ঠিক করে দিলেন এবং সময় বাড়িয়ে দিলেন।

হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব মু. জি. একবার বলেন, তালেবে-ইলমী যমানায় অনেক সময়ে এমন হতো যে, পুরোরাত মুতালা'আয় কেটে গেছে। মাওলানার স্মরণশক্তি ও যোগ্যতার কথা আমাদের এলাকায় প্রসিদ্ধ। সে-মেহনতের ফল এ ছিলো যে, হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ রহ. ডাবেলে হাদীস শরীফ পড়ানোর জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু পিতামাতার খিদমতের কারণে যেতে পারেননি। প্রায় তিরিশ বছর ধরে ফতেহপুরের মাদ্‌রাসায়ে ইসলামিয়ায় সদরে মুদাররিসের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আজব নূর সাহেব একবার বলেন, 'অনেক সময়ে এমন হতো যে, আমি ইশার পর মুতালা'আ শুরু করতাম এবং ফজর পর্যন্ত নিমগ্ন থাকতাম।' এ-মেহনতের ফল এ হয়েছে যে, সকল কিতাব পড়াতেন। কোনো কিতাব মুতালা'আ করার প্রয়োজন প্রায় হতোই না।

২. সবকের পাবন্দী

তালেবে-ইলমের জন্য উচিত হলো কখনো সবক নাগাহ্ না করা। কারণ এতে বে-বরকতী হয়। অনেক সময়ে এ না-কদরীর ফলে ইলম থেকে মাহরূম থাকতে হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র জীবনীতে রয়েছে, দীর্ঘকাল তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.র সাহচর্যে ছিলেন। কিন্তু এ দীর্ঘকাল একদিনও এমন যায়নি যে, ফজরের নামাযে তিনি ইমাম সাহেবের সাথে শরীক হননি। ইমাম সাহেব ফজরের নামাযের পরই দরস শুরু করে দিতেন। একখানে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি অনেক বছর যাবৎ ইমাম সাহেবের সাথে ছিলাম। অসুস্থতা ব্যতীত ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনও তার থেকে আলাদা থাকিনি।' অথচ এ-দিনগুলোয় মানুষ তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কাটায়। কিন্তু তিনি মজলিসে-ইলমীর মধ্যে শরীক হওয়াকে এবং স্বীয় উস্তাদের সাহচর্যকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

'মানাকেবে মুওয়াফ্‌ফিক'-এর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র বয়ান বর্ণনা করা হয়েছে-

مات ابن لی فلم احضر جهازه و لا دفنه و ترکته علی جیرانی و اقربائی مخافة ان یفوتنی من ابی حنیفة شیئ و لا تذهب حزنه عنی

'আমার এক ছেলের ইন্তেকাল হয়েছিলো। কিন্তু আমি যেতেও পারিনি এবং তার জানাযায় শরীকও হতে পারিনি। কাফন-দাফনের কাজ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-

প্রতিবেশীর ওপর সোপর্দ করে দিয়েছি - এ আশঙ্কায় যে, ইমাম সাহেবের দরসের একটি অংশ হয়তো ছুটে যাবে, যার আক্ষেপ কখনো শেষ হবে না।'

হযরত ক্বারী আব্দুর রহমান সাহেব পানিপথীর জীবনীতে রয়েছে, তিনি দিল্লীতে হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস রহ.র নিকট পড়তেন। শাহ সাহেব রহ.র ইন্তেকালের পর তিনি সবসময়েই চিন্তিত থাকতেন। একরাত তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, হযরত শাহ সাহেব রহ. বলছেন, 'তুমি দুঃখিত হয়ো না। আর শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব সম্পর্কে তিনি বললেন যে, তার নিকট গিয়ে ইলম হাসিল করো।' ইলমের প্রতি তাঁর মনোযোগ ও দরসের পাবন্দীর অবস্থা এ ছিলো যে, মাদ্‌রাসার ছুটির বাইরে তিনি কখনও বাড়ি যেতেন না। আর চিঠি আসলে সেগুলো পড়তেনও না এবং সেগুলোর উত্তরও দিতেন না। পানিপথ দিল্লী থেকে অনেক দূরের নয়। অনেক লোকেরই আসা-যাওয়া ছিলো। যদি আত্মীয়-স্বজন কারো সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যেতো তো সালাম এবং সালামের জবাব ব্যতীত অন্য কোনো কথা বলতেন না। বলতেন, 'এখানে আমার সময় নেই। পানিপথ গেলে সেখানে কথা বলবো।' মাদ্‌রাসা থেকে দূরে থাকতেন। একবার প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। নিকটের তালেবে-ইলমরা সবাই মাদ্‌রাসায় পৌঁছে গেছে। ক্বারী সাহেবের অপেক্ষায় হযরত শাহ সাহেব বসে ছিলেন। তালেবে-ইলমরা বললো, 'আজ অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। ক্বারী সাহেব আসতে পারবে না।' হযরত শাহ সাহেব চুপ থাকলেন। এ সময়ে ক্বারী সাহেব ভিজতে ভিজতে কিতাব নিয়ে পৌঁছলেন। ঠান্ডার কারণে কাঁপছিলেন। হযরত শাহ সাহেব আনন্দিত হলেন। ছাত্রদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ক্বারী সাহেব সবক নাগা করবে না।' এরপর বললেন, 'ক্বারী সাহেবকে তোমরা চেনো না। তাকে আমি হাদীসের 'আলফায' পড়াই আর আমি তার থেকে হাদীসের 'রূহ' হাসিল করি।'

আজকালের তালেবে-ইলমের শিক্ষা নেওয়া চাই যে, এতো অভাব সত্ত্বেও যে, ছাতার ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো না এবং এতো দূরে থাকা সত্ত্বেও সবকের মধ্যে নাগা করেননি। আজকাল সামান্য বৃষ্টি হলেই মাদ্‌রাসা চার দেওয়ারীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কামরা হতে দরসগাহ পর্যন্ত যাওয়া পছন্দ করে না। তাদের আকাঙ্ক্ষা হয় যে, পুরো মাদ্‌রাসা বন্ধ করে দেওয়া হোক। আর যদি কোনো তালেবে-ইলমের খেয়াল এদিকে না যায়, তাহলে উস্তাদরা ছাত্রদের দিয়ে দরখাস্ত দেওয়ায়। বাস্তবতা হলো, আগের তালাবাও নেই, আর আগের উস্তাদও নেই। তো সে-ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসার 'খায়র ও বরকত' কীভাবে হবে?

আল্লামা ইবনে জওযী রহ. বলেন, 'আমি সবকে পৌঁছার জন্য এভাবে দৌড়াতাম যে, দৌড়ের কারণে আমার শ্বাস ফুলে যেতো।'

ইমাম সা'লাব বলেন, 'পঞ্চাশ বছর যাবত আমি সবসময়ে ইবরাহীম হরবীকে আমার মজলিসে উপস্থিত পাচ্ছি। কখনও তাকে নাগা হতে দেখিনি।'

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মী-যী রহ.র জীবনীতে 'দাওয়াত ও আযীমত'-এর লেখক লিখেন, 'তিনি ইলম হাসিল করার জন্য নিজ দেশ হতে সফর করেছিলেন। ছাত্রজীবনে যে সকল চিঠি পৌঁছতো, সেগুলো একটি থলের মধ্যে রেখে দিতেন। এ আশঙ্কায় পড়তেন না যে, সেগুলো তবীয়ত বিগড়ে দিবে যা উদ্দেশ্যপূরণে বাধার সৃষ্টি করবে।'

আজকাল ছাত্রদের তা'আল্লুক এতো বেশী হয়ে পড়েছে যে, তাদের চিঠি লেখা ও ডাক দেখা থেকেই ফুরসৎ নেই। আজ এক দোস্তকে চিঠি লেখল তো কাল আরেকজনকে। এমনকি তার এ-প্রিয়(!) ব্যস্ততার জন্য সবকও কোরবান দিতে ইতস্ত করে না। যদি কোনো বন্ধু এসে গেলো তো তার সাথে প্রমোদ-বিহারে চলে গেলো। সপ্তাহকে-সপ্তাহ কিতাবের মধ্যে হাতও লাগে না। এমন অবমূল্যায়ন ও অমনোযোগীতা সহকারে মুতালা'আ করার আগ্রহ ও কিতাবের সাথে মুনাসাবাত কীভাবে পয়দা হবে? এ কারণেই তালেবে-ইলমীর যমানা তাড়াতাড়ি শেষ করে অন্য কোনো কাজে লেগে যায়।

হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া উন্দুলূসী রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে ইলম অর্জন করার জন্য এসেছিলেন। একদিন শোরগোল উঠল যে, 'হাতি এসেছে! হাতি এসেছে!'। আরবের মধ্যে হাতি একটি অদ্ভুত জিনিস। সে-আওয়ায শুনতেই তালাবারা দরস ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো। কিন্তু ইয়াহইয়া রহ. সেভাবেই শান্ত হয়ে বসে রইলেন। ইমাম মালেক রহ. বললেন, 'তোমাদের দেশেও তো হাতী নেই। তুমি কেনো গেলে না?' ইয়াহইয়া জবাবে বললেন, 'হযরত! আমি উন্দুলূস হতে আপনাকে দেখতে এবং ইলম শিখতে এসেছি। হাতী দেখার জন্য দেশ ছাড়িনি।' ইমাম মালেক রহ. এ জবাব শুনে আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁকে 'উন্দুনূসের জ্ঞানী' উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন।

আজকাল তালেবে-ইলমরা বাঁদর, কুমীর ইত্যাদি দেখার জন্য মাদ্‌রাসা খালি করে চলে যায়। সিনেমা, থিয়েটার, নাটকের আসক্তরা তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ কিতাবের চেহারাই দেখে না।

উস্তাযুল ক্বোর্‌রা হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ফতেহ মুহাম্মদ সাহেব পানিপথী প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করেছিলেন এবং একটি মাদ্‌রাসার মুহতামিম

হয়েছিলেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি তালেবে-ইলমদের দরসী কিতাব ও কিরাআত পড়াতেন। কিন্তু যোহরের নামাযের পর প্রায় এক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে হযরত মাওলানা আব্দুল হালিম সাহেব পানিপথীর নিকট গিয়ে তাঁর থেকে ইলম হাসিল করতেন।

হযতর ক্বারী সাহেব রহ. জন্মগতই অন্ধ ছিলেন। ইলমে কিরাআত তিনি শায়খুল ক্বোর্‌রা হযরত ক্বারী মুহীউল ইসলাম পানিপথী নিকট শেষ করেছেন। অধিকাংশ দরসী-কিতাব ও দাওরায়ে হাদীস হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম সাহেবের নিকট পড়েছেন। প্রত্যেক বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তবে ইলমে কিরাআতে আরব ও আজমের মধ্যে তাঁর সমতূল্য কেউ ছিলেন না। তিনি এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ কিতাব 'শাতেবী'র উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ছেপেছে। হযরত করাচীতে অবস্থান করছেন। তাঁর 'হালাত ও কামালাত' নিয়ে একটি বিরাট কিতাব লেখা যেতে পারে। আফসোস! শত আফসোস! পরিস্থিতি আমাদের এমনভাবে অপারগ করে রেখেছে যে, আমরা এমন গুণী ও মেহেরবান উস্তাদের যিয়ারত করা থেকেও বঞ্চিত। আল্লাহ পাক আমাদের হাশর ও জান্নাতের মধ্যে তাঁর সাহচর্য নসীব করুন!

৩. তাকরার ও মুযাকারা

তালেবে-ইলমদের জন্য উচিত হলো মনোযোগ সহকারে সবক শুনবে। এরপর সেটার তাকরার করবে। এ ছাড়া যোগ্যতাও সৃষ্টি হতে পারে না এবং ইলমও বাকী থাকতে পারে না।

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, 'মুযাকারা না করার কারণে তা ভুলে যায় এবং ইলম বিনষ্ট হয়ে যায়।' হযরত আলকামা রহ. বলেন, 'হাদীসের মুযাকারা করো। কারণ, মুযাকারা করা হলে ইলম বৃদ্ধি পায়।'

ইসমাঈল রাজা-র নিয়ম ছিলো, তিনি মকতবের বাচ্চাদের নিকট এসে হাদীস শোনাতেন যেনো তা ভুলে না যান। হযরত সা'য়ীদ ইবনে জুবায়ের রহ. বলেন, 'হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে হাদীস শোনাতেন।'

'আওন ইবনে আব্দুল্লাহর বর্ণনা করেন, একদিন আমরা উম্মে দারদা রাযি.র খিদমতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ইলমী বিষয় জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। এরপর আমরা আরয করলাম, 'আপনি হয়তো বিরক্ত হয়ে গেছেন।' তিনি বললেন, 'তোমরা বলছো কি! প্রত্যেক কাজেই আমার নিয়্যত থাকে ইবাদত। কিন্তু ইলমী মুযাকারা হতে অধিক আনন্দ অন্য কোনো কাজে পাই না।'

হযরত আলী রাযি. বলেন, 'ইলমী বিষয়ে আলোচনা করতে থাকো। এতে তোমাদের মর্যাদা প্রকাশ পাবে।'

'তা'লীমুল মুতা'আল্লিম' কিতাবে রয়েছে, তালেবে-ইলমের জন্য এটা আবশ্যকীয় যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আগের সবকের তাকরার না করবে এবং ভালোভাবে না ইয়াদ করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত পরের সবক পড়বে না। তালেবে-ইলমের জন্য সবকের তাকরার খুবই জরুরী। আর এ কাজটি তালেবে-ইলমের জন্য খুবই উপকারী।

এক জায়গায় লিখেন, 'আগের সবকগুলোর তাকরার বারবার করতে থাকবে এবং এ আমলটি জারী রাখবে।' আরেক জায়গায় এর পদ্ধতি এভাবে লিখেছেন যে, 'আগের সবকের তাকরার পাঁচবার করবে। এর আগের সবকের তাকরার চারবার, এর আগের সবকের তিনবার, এর আগের সবকের দু'বার এবং এর আগের সবকের একবার তাকরার করবে। প্রত্যেকদিন এরূপ আমল করা চাই। ইলম রক্ষা করার জন্য এটা হলো উত্তম পদ্ধতি।'

তাকরার করতে কোনো প্রকার আড় বা লজ্জাবোধ করবে না। যে তালেবে-ইলমের এরূপ হয় সে ইলম থেকে মাহরূম থাকে।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র জীবনীতে রয়েছে, কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি উপোস থাকতেন। কিন্তু সবকের তাকরার বাদ দিতেন না এবং মেহনতের মধ্যেও কোনো তফাৎ আসতো না। এরপর লিখেন, আমাদের উস্তাদ বুরহানুদ্দীন বলেন, আমি আমার সকল সাথীদের মধ্যে এ কারনে মর্যাদা পেয়েছি যে, তাকরার ও মুযাকারা কখনও ছাড়িনি।

আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁদের শাগরেদদের মুযাকারা করার অনেক তাকিদ দিতেন।

আতা' খুরাসানী রহ.র জীবনীতে রয়েছে, তিনি যখন কাউকে পেতেন না, তো গরীব-মিসকীনদের নিকট গিয়ে তাদের দ্বীনের কথা শোনাতেন।

আছমা'য়ী রহ.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 'আপনি এ ইলম কীভাবে হিফাযত করেছেন? অথচ আপনার সাথীরা সব ভুলে গেছে।' তিনি বললেন, 'আমার সাথীরা ইলম হাসিল করার পর তা ছেড়ে দিয়েছে। আর আমি সবসময়ে মুযাকারা করেছি।'

সাইয়্যেদ শরীফ জুরজানী রহ.র ঘটনা প্রসিদ্ধ যে, তিনি আল্লামা কুতবুদ্দীন রাযীর নিকট পড়ার জন্য সে-সময়ে গিয়েছেন, যখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বার্ধক্যের উযর পেশ করলেন এবং তাঁকে তাঁর এক শাগরেদ

মুবারক শাহ্-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এ মুবারক শাহ ছিলেন আল্লামা কুতবুদ্দীনের গোলাম। তিনি মুবারক শাহকে প্রতিপালন করেছেন এবং ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মুদাররিস হয়ে গেছেন এবং প্রত্যেক 'ইলম ও ফন'-এর মধ্যে অভিজ্ঞ ছিলেন।

সাধারণত লোকেরা তাঁকে 'মুবারক শাহ মানতেকী' নামে আখ্যায়িত করতো। আল্লাহ জানেন, কী কারণে মুবারক শাহ মীর সাহেবকে তাঁর দরসের মধ্যে শুধুমাত্র বসার ও শোনার অনুমতি দিয়েছেন। জিজ্ঞেস করার ও কিরাআত করার অনুমতি দেননি। একবার মুবারক শাহ রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়লেন, দেখবেন, এ শাগরেদ কী করে? তিনি চুপে-চুপে সাইয়্যেদ সাহেবের কক্ষের নিকট পৌঁছলেন। সেখান থেকে আওয়ায আসছিলো যে, 'কিতাবের মধ্যে মুসান্নিফ তো এ মাসয়ালাটি এ-ভাবে লিখেছেন। আর উস্তাদ এ-ভাবে বলেছেন। আর আমি এ মাসয়ালার তাকরীর এ-ভাবে করছি।' মুবারক শাহ দাঁড়িয়ে গেলেন। কান লাগিয়ে শুনতে লাগলেন। মীর সাইয়্যেদ শরীফের তাকরীরের ধরন এতোই মনোমুগ্ধকর ছিলো যে, মুবারক শাহের 'ওজদ' এসে গেলো।

এর আগের কালে উস্তাদগণ তাঁদের শাগরেদদের তাকরারের ওপর অনেক জোর দিতেন। এর ফল এ ছিলো যে, তালাবারা পড়ার যমানায়-ই এতোটা অভিজ্ঞ হয়ে যেতো যে, তাদের পড়া-কিতাবগুলোর সবক উস্তাদগণ তাদের দিয়েই পড়িয়ে নিতেন।

হযরত মাওলানা আব্দুল হাই রহ. তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেন, 'আমি যে কিতাবই পড়া থেকে ফারেগ হতাম, সেটা পড়ানোর মধ্যে লেগে যেতাম।' এরপর তিনি লিখেন, 'আল্লাহ তা'আলার অপার মেহেরবানীতে সকল ইলমের মধ্যে আমার পূর্ণ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কিতাব বোঝানো আমার নিকট কঠিন মনে হতো না - চাই তা যে কিতাবই হোক, যে বিষয়েরই হোক। এমনকি আমি এমন কিতাবও পড়িয়েছি, যা আমি উস্তাদ থেকে পড়িনি। যেমন তূসীর 'শরহে ইশারাত', 'উফুকুল মুবীন' কানূনুন তিব্ব ও রাসায়েলুল আরূয।'

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা সাধারণ কোনো যোগ্যতার ফল হতে পারে না। তা-ও আবার সে-কালে পড়ানো, যে-কালে আলোচনা ও মুবাহাসা ব্যতীত কোনো তালেবে-ইলম সবক পড়তো না। এরূপ কালে তালেবে-ইলমদের আগ্রহ মিটিয়ে পড়ানো সাধারণ কোনো কাজ ছিলো না।

এরপর তিনি লিখেন, 'যে-তরীকায় আমি ছাত্রদের পড়াতাম তার ওপর তারা খুশী ছিলো।'

মাওলানা হুসাইন আহমদ ইলাহবাদী হযরত মাওলানা আব্দুল হাইয়ের নিকট পড়তেন। শেষ কিতাব ব্যতীত অন্যান্য সব কিতাব শাগরেদ দিয়েই পড়িয়ে নিতেন।

হযরত মাওলানা সা'য়ীদ আহমদ সাহেব, মুহাদ্দিসে লক্ষোভী রহ. এ অধমের (লেখকের) নিকট তাঁর নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন, সবকের পরে যদি তাকরারের জন্য কোনো তালেবে-ইলম না পেতাম, তো দেওয়ারের সামনে বসে যেতাম। দেওয়ারকে লক্ষ করে সবকের তাকরার করতাম। আর এটা ধরে নিতাম যে, আমার মুখাতাব এখনও কথা বোঝেনি। তাই আবার তা বলতাম। এভাবে কয়েকবার বলতাম। এতে আমার পড়া 'আযরব' হয়ে যেতো।

অষ্টম আদব

ইলমের আকাঙ্ক্ষা ও এর জন্য সফর

তালেবে-ইলমদের ইলমের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। যদি জন্মভূমিতে থেকে ইলম হাসিল করার সুযোগ না থাকে, তাহলে তার জন্য সফর করবে। আগেরকালে লোকেরা এক-একটি হাদীসের জন্য এবং দ্বীনের এক-একটি মাসয়ালার জন্য মাসের পর মাস সফর করতেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করতেন। একটি মাসয়ালা শেখা হলে তাঁরা ততোটা আনন্দিত হতেন, যতোটা আনন্দিত কোনো দুনিয়াদার বাদশাহী পেয়ে ফেললে হয়।

হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কোনো মু'মিন ব্যক্তি ইলম দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে জান্নাতে প্রবেশ করে।'

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, 'দু'জন লোভী এমন রয়েছে, যাদের লোভ কখনও শেষ হয় না। একজন হলো ইলমের লোভী, আরেকজন হলো দুনিয়ার লোভী।'

হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'কতদিন পর্যন্ত ইলম অর্জন করা চাই।' বললেন, 'যতোদিন পর্যন্ত জীবন থাকে।'

হযরত জাবাল বিন কায়েস রহ. বলেন, জনৈক ব্যক্তি মদিনা হতে সফর করে হযরত আবুদ্দারদা রাযি.র খিদমতে দামেস্ক এসে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। হযরত আবুদ্দারদা রাযি. বললেন, 'তুমি কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসোনি? ব্যবসা ইত্যাদি কি তোমার উদ্দেশ্য ছিলো না? তুমি কি শুধু হাদীসের তালাশেই বের হয়েছ?' সে বললো, 'হ্যাঁ। আমার এটাই উদ্দেশ্য।' এতে আবুদ্দারদা রাযি. বললেন, 'যদি এটাই হয়, তাহলে তুমি আনন্দিত হও। কারণ, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে-ব্যক্তি ইলমের তালাশে বের হয় ফেরেশ্‌তারা তার জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। জান্নাতের রাস্তা তার জন্য আসান হয়ে যায়। আলেমের জন্য আসমান ও যমীনের সকল প্রাণী - এমনকি সমুদ্রের মাছও - মাগফিরাতের দু'আ করে। আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ, যেরূপ তারকারাজির ওপর চাঁদের মর্যাদা। আলেমরা হলো নবীর ওয়ারিস। নবীগণ দিনার-দিরহাম রেখে যান না;

ইলম রেখে যান। যে-ব্যক্তি ইলম হাসিল করলো, সে বড় একটি দৌলত অর্জন করলো।'

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি একটি হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, অমুক সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনেছেন। তখনই আমি উট ক্রয় করে সে-সাহাবীর তালাশে বেরিয়ে পড়লাম। এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করার পর শাম দেশে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রাযি.র নিকট পৌঁছলাম, যিনি ঐ-হাদীসটি শুনেছিলেন। তাঁর দরওয়াযায় উট বসিয়ে ঘরে খবর পাঠালাম যে, জাবির আপনার চৌকাটে দাঁড়িয়ে আছে। খাদেম ফেরত এসে বললো, আমার মনিব বলেছেন যে, 'আপনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। একথা শুনেই আব্দুল্লাহ বিন উনাইস বেরিয়ে এলেন এবং আমার সাথে মু'আনাকা করলেন। আমি বললাম, 'শুনেছি, আপনার নিকট জুলুম সম্পর্কিত একটি হাদীস রয়েছে, যা আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনিনি।' তিনি জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা লোকদের এমতাবস্থায় একত্রিত করবেন যে, তারা উলঙ্গ-দেহ ও খালি-পা হবে। এরপর তাদের এমন আওয়াযে আহ্বান করবেন যে, দুরের ও নিকটের সবাই শুনতে পাবে। বলবেন, আমি হলাম ইনসাফগার বাদশাহ। কোনো জান্নাতী জান্নাতে যেতে পারবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না এ-দোযখীরাও তার থেকে জুলুমের বদলা নিয়ে নিবে। এমনকি একটা চড়ের দাবীদারও (তার থেকে বদলা নিয়ে নিবে)। দোযখীদের সম্পর্কেও এরূপ বললেন। আমি আরয করলাম, সেখানে বদলা কীভাবে দেওয়া হবে, যখন তারা খোদার সামনে উলঙ্গ-দেহ ও খালি-পা থাকবে? জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নেকী ও বদী দ্বারা।' অর্থাৎ প্রথমে হকদারকে নেকী দেওয়া হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে, যার হক তার বদী তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

আবু সা'য়ীদ আ'মা থেকে বর্ণিত, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. মদিনা হতে মিসর শুধু একারণে সফর করেছেন যে, হযতর উকবা বিন আমের রাযি. থেকে একটি হাদীস শ্রবণ করবেন। তিনি সেখানে পৌঁছলে হযতর উকবা তাঁকে ইসতিকবাল করলেন। হযরত আবু আইয়ুব রাযি. বললেন, 'আমি একটি হাদীসের জন্য এসেছি, যার শ্রবণকারীদের থেকে একমাত্র আপনিই বাকী রয়েছেন।' হযরত উকবা রাযি. হাদীস বললেন যে, 'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো মুমিন কারো দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ গোপন রাখবেন।' হযরত আবু

আইয়ুব রাযি. এ-হাদীস শোনামাত্র উটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেটার ওপর সওয়ার হয়ে এক-মূহূর্তও বিলম্ব না করে মদিনায় ফেরত এলেন।

হযরত সা'য়ীদ বিন মুসাইয়্যিব রহ. বর্ণনা করেন, 'আমি একটি হাদীসের জন্য কয়েকদিন এবং কয়েকরাত সফর করতাম।'

শা'বী রহ. বলেন, 'যদি কোনোব্যক্তি শামের শেষ প্রান্ত থেকে ইয়ামানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এ জন্য সফর করে যে, ইলমের একটি বিষয় শ্রবণ করবে; তো আমার মতে তার সফর বিফল হয়নি।'

হযরত আবুদ্দারদা রাযি. হতে বর্ণিত, 'কেউ যদি ইলম তলবের জন্য সফর করাকে জিহাদ মনে না করে, তবে তার আকলের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।'

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'জাহেল অবস্থায় মারা যাওয়ার ভয়ে যে-ব্যক্তি ইলম তালাশে বের হয় অথবা সুন্নাত মিটে যাওয়ার আশঙ্কায় সেটা যিন্দা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে, তো তার উপমা হলো সে-গাযী, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য বেরিয়েছে। যাকে তার আমল পেছনে ফেলেছে তাকে তার নসব আগে বাড়াবে না।'

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, 'আপনি কতদিন পর্যন্ত ইলম হাসিল করবেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'মৃত্যু পর্যন্ত।'

ইবনে আবি গাস্সানের উক্তি, 'মানুষ ততোক্ষণ পর্যন্ত আলেম, যতোক্ষন পর্যন্ত সে তালেবে-ইলম। আর তখন সে জাহেল, যখন সে তালেবে-ইলমীকে বিদায় জানায়।'

ইবনে শাবীবের উক্তি, 'তরবিয়্যত দ্বারা তবিয়তের গঠন হয়। আর তালাশ করা দ্বারা ইলম পাওয়া যায়।'

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র উস্তাদের সংখ্যা একশ'রও ওপরে, বিভিন্ন স্থানে গিয়ে যাঁদের থেকে ইসতিফাদা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ.র মৃত্যুর পর ইমাম মুহাম্মদ রহ. মক্কা মুকাররামা, মদিনা মুনাওয়ারা, বসরা, ওয়াসেত, শাম, খোরাসান, ইয়ামামা, প্রভৃতি দেশে গিয়ে অসংখ্য উস্তাদ থেকে ইসতিফাদা করেছেন।

ইসহাক বিন রাহওয়ের জীবনীতে রয়েছে, তখনকার দিনে দ্বীনি মাদ্রাসাগুলো অনেক দুরে-দূরে থাকতো। এতৎসত্ত্বেও তিনি সবখানে গিয়ে উলামা ও মুহাদ্দিসদের থেকে ইসতিফাদা করেছেন।

সুফ্‌য়ান ইবনে উয়াইনা রহ. আশিরও অধিক সংখ্যক উলামা থেকে ফয়েয নিয়েছেন এবং এর জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন।

হযতর আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. সম্পর্কে আবু উসামা বলেন- ما رأيت رجلا اطلب للعلم فى الافاق من ابن المبارك

'আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. হতে অধিক দেশে ঘুরে ঘুরে ইলম অর্জনকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।'

ইমাম শু'বা রহ. প্রায় চারশ' তাবে'য়ী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এর জন্য দূর-দূরান্তে তিনি সফর করেছেন। অনেক সময়ে একটি হাদীসের জন্য হাযার মাইলও সফর করতে হয়েছে।

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ইলম তলবের আগ্রহে মক্কা মুকাররামা ও মদিনা মুনাওয়ারা, বাগদাদ, কূফা, ইয়ামান, প্রভৃতি দেশে সফর করেছেন।

আবু হাতেম রাযি সম্পর্কে 'তাযকেরাতুল হুফ্‌ফায' কিতাবে লেখা রয়েছে, 'অল্প বয়সেই ইলমের তলবে তিনি দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বছরের পর বছর তিনি সফর করতে থাকেন। দেশে ফিরে আসতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আবার বেরিয়ে পড়তেন।'

ইমাম যাহাবী রহ. এ-ও লিখেন, 'প্রথমবার যখন ইলম অন্বেষণে বের হন তখন সাত বছর পর্যন্ত সফর করতে থাকেন। বাহরাইন থেকে পায়ে হেঁটে মিসর সফর করেছেন। আবার রমলা থেকে তরতূসের সফরও পায়ে হেঁটেই করেছেন। সে-সময়ে তাঁর বয়স ছিলো বিশ বছর।'

ইমাম বুখারী রহ. ইলমের তলবে সকল ইসলামী শহর ভ্রমণ করেছেন।

আবু লাইস বিন সা'দ বিভিন্ন ইসলামী দেশ সফর করেছেন এবং তথাকার উলামা থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে পঞ্চাশেরও অধিক কিবারে-তাবে'য়ীন রয়েছেন।

ইমাম মালেক রহ. প্রসিদ্ধ তাবে'য়ী সা'য়ীদ বিন মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আমি একটি হাদীসের জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সফর করেছি।'

ইবনুল মুকরী রহ. বলেন, 'আমি শুধুমাত্র একটি নুসখার জন্য সত্তর মনযিল পর্যন্ত সফর করেছি।'

আমার (লেখকের) আব্বাজানের উস্তাদ মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব - যিনি নিকটেই ছনহারালালপুর থাকেন - তিনি ইলম অর্জন করার জন্য পানিপথ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সফর করেছেন। বার বছর পর যখন তিনি ইলম অর্জনশেষে

আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিতাবের কয়েকটি বাক্স ছিলো। তাঁর অনেক আশ্চর্য-আশ্চর্য ঘটনা রয়েছে।

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী রহ. ইলম অর্জন করার জন্য পানিপথ, দিল্লী, সাহারানপুর, রামপুর, বেরেলী, প্রভৃতি স্থানে সফর করেন। সকল প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর জীবনীতে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মুহাম্মদ হানিফ নামক প্রতাপগড়ের এক তালেবে-ইলম ছিলো। বয়স্ক হওয়ার পর তার ইলম শিখার আগ্রহ হলো। বিভিন্ন স্থান সফর করে পানিপথ পৌঁছলো। সেখানে অনেকদিন পড়ালেখা করেছিলো। যে-বছর আমি পানিপথ থেকে সাহারানপুর গেলাম, সে-বছরই সে-ও তিনদিন পর পৌঁছল। সে তার সফরের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছে, 'আমি যখন পানিপথ থেকে রওয়ানা হলাম তো তখন আমার নিকট সামান্য কয়েটি পয়সা ছিলো। পায়ে হেঁটে সফর করেছি। কিতাব অনেক ছিলো। তাই অর্ধেক সামান কিছুদূর নিয়ে রেখে আসতাম। আবার বাকী অর্ধেক নিয়ে সামনে যেতাম। যেখানে রাত হতো সেখানেই থেকে যেতাম। যতোদিন পর্যন্ত পয়সা ছিলো, ছোলা ইত্যাদি খেয়ে নিতাম।' এভাবে কয়েক সপ্তাহ সফর করে সাহারানপুর পৌঁছেছে। যখন আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় তো তার চোখে পানি এসে গেছে। সে বললো, 'কয়েকদিন যাবৎ উপোস। আমাকে খাবার দাও।' সে বড়ই মুত্তাকী ছিলো। কারও নিকট কোন কিছু চাইতো না। তাকবীরে-উলাসহ সফ্ফে-আওয়ালে নামায পড়তো। পড়ালেখা-শেষে কিছুদিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিলো। এরপর কিছুদিন ফরখাবাদ অবস্থান করেছিলো।

একবার আমার নিকট চিঠি লিখেছিলো যে, তোমার নিকট এটাই আমার শেষ চিঠি। এখন আমি এমন স্থানে জীবন কাটাবো যেখানে আমাকে কেউ চিনে না এবং জানে না। এরপর থেকে আমি আর জানতে পারিনি যে, সে কোথায় আছে?

হাফেযে-হাদীস আবুল আব্বাস রাযি. জন্মগত অন্ধ ছিলেন। এদৎসত্ত্বেও হাদীসে পাক অর্জন করার জন্য বলখ, বুখারা, নিশাপুরসহ বিভিন্ন শহর সফর করেছেন।

হাফেয ইবনে তাহের মুকাদ্দেসী রহ. হাদীসের অন্বেষণে পায়ে হেঁটে সফর করতেন। পিঠের ওপর কিতাব থাকতো। কষ্টের কারণে পেশাবের সাথে রক্ত এসে যেতো।

'উলামায়ে সলফ'-এর মুসান্নিফ লিখেন, 'তিনি নিম্নোল্লিখিত স্থানসমূহ ছাড়াও আরও অনেক স্থানে সফর করেছেন।

বাগদাদ, মক্কা মুকাররমা, জযীরায়ে তিনস, দামেস্ক, হলব, জযীরায়ে ইস্পাহান, নিশাপুর, হেরাত, রহবা, লুকান, মদিনা মুনাওয়ায়ারা, নাহাওবন্দ, হামদান, ওয়াসেত, সাদা, ইস্তারাবাদ, আনবার, ইসফারায়েন, আমেল, আহওয়ায, বুস্তাম, খসরুজরদ, জুরজান, আমদ, ইউবাখ, বসরা, দীনুরী, সরখাস, সিরাজ, কাযভীন, কূফা।'

হাফেয আবু আব্দুল্লাহ ইসফাহানী একবার তাঁর সফর-করা স্থানগুলোর বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি একশ' বিশটি স্থানের নাম বলেছেন, যেখানে তিনি ইলমের জন্য সফর করেছিলেন।

ইমাম ইয্যুদ্দীন মুকাদ্দেসী চৌদ্দ বছর বয়সে ইলম হাসিল করার জন্য বাগদাদ গিয়েছেন।

হাফেয আবুল খাত্তাব উন্দুলূসী রহ. ইলম হাসিল করা উদ্দেশ্যে প্রথমে স্পেনে সফর করেন। সেখান থেকে ফারেগ হয়ে মারাকেশ ও অন্যান্য দেশ সফর শেষ করে মিসর পৌঁছলেন। মিশরের পর শাম, ইরাক, আরব ও খোরাসানের সফর করেন।

আবু হাতেম রাযী রহ. বলেন, 'সফরের মধ্যে একবার জাহাজ থেকে নামলাম। খরচের পয়সা মোটেই ছিলো না। আরও দু'জন সাথী ছিলো। তাদেরও একই অবস্থা। আমরা তিনজন তিনদিন উপোস থেকে পায়ে হেঁটে সফর করেছি।'

বর্তমান অবস্থা দেখে একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, 'আমাদের মধ্যে এমনও লোক ছিলেন, ইলমের জন্য শত শত মাইল পায়ে হেঁটে সফর করা যাদের জন্য সহজ ব্যাপর ছিলো। সে-সকল বুযুর্গের অন্তরে ইলমের আগ্রহের অস্থিরতা ছিলো, যা তাদের কোনো শহরে বা কোনো দেশে স্থির থাকতে দিতো না। এক সমুদ্র হতে আরেক সমুদ্রে, এক দেশ হতে আরেক দেশে তারা ইলমের খোঁজে চষে বেড়াতেন। আজ যদি আমাদের মধ্যে এর এতোটুকুও গন্ধ থাকতো, তাহলে ইলমের এ অবনতি হতো না।

দরজা দরজা ঘুরা ব্যতীত এবং আহলে কামালদের মজলিসে অংশ নেওয়া ব্যতীত ইলমের মধ্যে পূর্ণতা আসে না।

'বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন'-এ রয়েছে, আবু বকর ইসমাঈলের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ইলম হাসিল করার জন্য কোথাও যেতে দিতো না। যখনই তিনি সফর করার ইচ্ছে করতেন তারা এসে বাধার সৃষ্টি করতো। এরই মধ্যে মুহাম্মদ বিন আইয়ুব রাযীর ইন্তেকাল হয়ে গেলো। তিনি তাঁর সময়ের বড় আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের খবর যখন ইসমাঈলের নিকট

পৌঁছলো, তো তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁর কয়ফিয়্যত এমন হলো যে, তিনি দেহের সকল কাপড় ছিড়ে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা একত্রিত হলো। জিজ্ঞেস করলো, এর কারণ কী? তিনি বললেন, দেখুন! কত বড় আলেম মারা গেলেন! আর আপনারা আমাকে তাঁর নিকট যেতে দেননি। এতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনরা সান্ত্বনা দিলো যে, ইনি মারা গেলেও তো এখনও অনেক আলেম রয়েছেন। যাঁর নিকট তোমার ইচ্ছে হয়, যাও। তাঁদের থেকে ফয়েয হাসিল করো। তিনি তাঁর জন্মভূমি হতে বের হলেন। বিভিন্ন শহর ও বিভিন্ন দেশের বড়-বড় উলামা ও মুহাদ্দিস থেকে ইলম হাসিল করে হাদীস ও ফিকহর সংকলনকারী হলেন।

'হামাসা'র ব্যাখ্যাতা খতীবে তিবরীযী আবুল মনসূরের রচিত একটি লোগাতের কিতাব পেয়েছিলেন, যা কয়েটি ছোটো-ছোটো খন্ডে বিন্যাস্ত ছিলো। সেটার মতলব উদ্ধার করার জন্য তিনি তাঁর শহরের এক আলেমের নিকট গেলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, 'আবুল আ'লা মা'রীর নিকট চলে যাও।' খতীব সে-সব খন্ড একটি থলিতে রেখে পিঠের ওপর নিয়ে পায়ে হেঁটে তিবরীয থেকে মা'রা রওয়ানা হলেন। ঘামে কিতাবের খন্ডগুলো ভিজে এমন হলো যে, বাগদাদের লোকেরা দেখে ভেবেছে, এটা বৃষ্টিতে ভিজেছে। এভাবেই খতীব মা'রা পৌঁছলেন এবং আবুল আ'লার খিদমতে হাযের হয়ে সেটার জটিল বিষয়গুলো বুঝে নিলেন।

নবম আদব

তলবে-ইলমীর মধ্যে অটল থাকা ও সকল কষ্ট বরদাশ্‌ত করা

তালেবে-ইলমরা অবশ্যই ইলমের মতো অমূল্য নিয়ামত হাসিল করার মধ্যে যে সকল কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলো বরদাশ করবে। আকাবিররা ইলমে-দ্বীনের জন্য কী ধরনের কষ্ট-মুসিবত সহ্য করেছেন, সেগুলো সামনে রাখবে। প্রত্যেক বিষয়ে অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এর মধ্যে লেগে ছিলেন। তাঁরা যদি এমন না করতেন, তাহলে আজ আমাদের পর্যন্ত দ্বীন কীভাবে পৌঁছতো? যাঁদের থেকে কিছু ফয়েয পৌঁছেছে, তাঁদের প্রায় সবাই তালেবে-ইলমীর সময়ে বড় বড় মুশকিলের সম্মুখীন হয়েছেন।

হযরত জাবির রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'দ্বীন যিন্দা করার জন্য যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে, সে নবীদের থেকে এক দরজা নিচে থাকে।'

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ও হযতর আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত, 'আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি ইলম হাসিল করার সময়ে মারা যায় তবে সে শহীদ।'

আসহাবে-সুফ্‌ফার অবস্থা এমন ছিলো যে, কয়েকদিন পর্যন্তও তাঁরা উপোস থাকতেন। কোথাও থেকে কোনো কিছু পাওয়া গেলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতেন। এভাবেই তাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং সারা জগতকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, 'ততোক্ষণ পর্যন্ত ইলম অর্জন হতে পারে না যতোক্ষণ না ইলমের পথে দারিদ্র ও উপোসের স্বাদ আস্বাদন করা হয়।' তিনি তাঁর উস্তাদ রবী'য়ার দরিদ্রতার অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, 'ইমাম রবী'য়া রহ. এতো অভাবী ছিলেন যে, তাঁকে তাঁর ঘরের চালও বিক্রয় করতে হয়েছে। তাঁর খাবার এভাবে ব্যবস্থা করতেন যে, নর্দমার পঁচা কিশমিশ তুলে নিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে নিতেন।'

ইমাম তবরানী রহ. ইলমে-হাদীস শিখতে গিয়ে অনেক মেহনত ও কষ্টের

সম্মুখীন হয়েছেন। তিরিশ বছর পর্যন্ত তাঁর বিছানা ছিলো না; চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়েছেন।

হাইসম বিন জামীলের আলোচনায় খতীব লিখেন, 'ইলমে-হাদীস তলবকালে দু'বার তিনি নিঃস্বতা ও অবলম্বনহীনতার শিকার হয়েছেন।'

ইমাম আহমদ রহ.র জীবনীতে রয়েছে, যখন তিনি মক্কা মুকাররমায় ইমাম সুফ্য়ান ইবনে উয়াইনার নিকট পড়ছিলেন - তাঁর সঙ্গীদের বর্ণনা - সে সময়ে একদিন দরসে উপস্থিত হননি, যা ছিলো তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী। সবাই আশ্চর্যবোধ করলো। কারণ, তিনি দরস নাগা করতেন না। অবস্থা জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে, কাপড় চুরি হয়ে গেছে। অন্য কোনো কাপড় ছিলো না। পয়সাও ছিলো না যে, ব্যবস্থা করে নিবেন।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী আলী বিন জাহম রহ. বলেন, আমি ইমাম সাহেবের খিদমতে কিছু আশরাফী পেশ করে বললাম, 'ইচ্ছে হলে এটা হাদিয়া হিসেবেও কবুল পারেন, আবার করযে-হাসানা হিসেবেও নিতে পারেন।' কিন্তু তিনি এর কোনোটাতেই রাযি হননি। তখন আমি বললাম, 'আমার জন্য কিছু কিতাবত করে দিন এবং তার বিনিময়ে এগুলো রাখুন।' তখন তিনি রাযী হলেন।

আলী ইবনে জাহম তাঁর হাতের সে লেখাটা বরকত হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। লোকদের দেখাতেন এবং তা লেখানোর কারণও সাথে সাথে বলতেন।

ইমাম আহমদ রহ.রই আরেক সাথী ইসহাক ইবনে রাহওয়ে রহ. বর্ণনা করেন, 'ইমাম আহমদ রহ. ইযার সেলাই করে-করে তালেবে-ইলমী যমানায় তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতেন। অন্যেরা কিছু দিতে চাইলেও তা নিতে অস্বীকার করতেন। ইয়ামান থেকে যখন চলে যাবেন, তখন রুটিওয়ালার কিছু পয়সা তিনি ঋণী ছিলেন। তাঁর নিকট টাকা ছিলো না। তাই পায়ের জুতো তাকে দিয়ে এসেছেন। খালি পায়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উটের ওপর বোঝা উঠানো-নামানোর কাজে লেগে গেলেন। সেখানে যে পারিশ্রমিক পেতেন সেটাই তাঁর পাথেয় ছিলো।'

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলতেন, 'আমাদের সাথে অসংখ্য লোক তালেবে-ইলম ছিলো। কিন্তু ফায়দামান্দ তারাই হয়েছে, যারা এ বিষয়ে আন্তরিক ছিলো।' এরপর বলতেন, 'আমাদের ঘরে খুব সকালেই রুটি তৈয়ার করা হতো। দই লাগিয়ে দেওয়া হতো। তা খেয়েই দরসে যাওয়া হতো। সেখান থেকে ফেরত এসে আবার তা-ই খাওয়া হতো। যারা খাওয়ার ব্যপারে সৌখিন ছিলো তারা

ভালো ভালো খাবারের ইনতিযামে লেগে যেতো এবং ইলমের অনেক অংশ থেকে মাহরূম থেকে যেতো।'

ইমাম শাফে'য়ী রহ. তাঁর তালেবে-ইলমীর অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, 'আমি ইয়াতিম হয়ে গিয়েছিলাম। মা আমাকে মকতবে পাঠিয়েছেন। কিন্তু উস্তাদের খিদমতে পেশ করার মতো কিছুই ঘরে ছিলো না। সৌভাগ্য যে, উস্তাদ একথার ওপর রাযী হয়ে গেলেন যে, তিনি বাইরে গেলে আমি বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ রাখবো। এভাবে যখন আমার কোরআন পড়া শেষ হলো, তো মসজিদে উলামাদের মজলিসে উপস্থিত হতে লাগলাম। যে হাদীস বা মাসয়ালা শুনতাম তা সাথে-সাথে ইয়াদ হয়ে যেতো। আমার মা এতো গরীব ছিলেন যে, কাগজের জন্য পয়সাও দিতে পারতেন না। বাধ্য হয়েই পরিস্কার হাড্ডি তালাশ করতাম। মিলে গেলে উঠিয়ে নিয়ে সেটার মধ্যে লেখা শুরু করে দিতাম। পুরোটা লেখা হলে ঘরের একটি পুরাতন ঘটিতে সাবধানে সেটা রেখে দিতাম।'

আল্লামা ইবনুল জওযী রহ. নিজের তালেবে-ইলমীর অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, 'সকাল-সন্ধ্যা এভাবে কাটতো যে, খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হতো না। কিন্তু আল্লাহর শোকর যে, মানুষের অনুগ্রহ হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

হযরত নিযামুদ্দীন রহ. পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তাঁর আম্মাজান, যিনি তাঁর সময়ে একজন নেককার ও আল্লাহ-প্রিয় মহিলা ছিলেন, তিনি তাঁর তা'লীমের ব্যবস্থা করলেন। অধিকাংশ সময়ে ঘরে উপোস যেতো। যেদিন ঘরে কোনোকিছু থাকতো না সেদিন তিনি বলতেন, আজ আমরা সবাই খোদার মেহমান। খাজা সাহেব বলেন, 'একথা শুনে আমার খুবই আনন্দ হতো। একদিন খোদার এক বান্দা এক তানকা (তৎকালে প্রচলিত একটি পরিমাপ) শস্য ঘরে দিয়ে গেছে। পরপর কয়েকদিন এর দ্বারা রুটি মিলতে থাকে। আমি এতে বিরক্ত হয়ে গেছি। এ আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, কবে আবার আম্মাজান বলবেন যে, আজ আমরা সবাই খোদার মেহমান। একসময়ে সে-শস্য শেষ হয়ে গেছে এবং আম্মাজান বলেছেন, আজ আমরা খোদার মেহমান। একথা শুনে আমি এতোটা আনন্দিত হয়েছি যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।'

খাজা সাহেবের জীবনে এ অভাব-অনটন শেষ পর্যন্ত ছিলো। একখানে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী দা.বা. লিখেন, 'খাজা সাহেব যখন দিল্লীকে তাঁর কিয়ামগাহ বানিয়ে নিয়েছেন তো সে-সময়ে সমস্ত হিন্দুস্থানের সম্পদ ও ধন-দৌলত দিল্লীতে উপচে আসছিলো এবং জিনিস-পত্রের দাম খুবই কম ছিলো। এক জিতল (তৎকালের প্রচলিত একটি মুদ্রা) দ্বারা ময়দার পাকানো দু'সের রুটি পাওয়া যেতো আর দু'জিতলে একমণ খরবুযা মিলে যেতো। কিন্তু

খাজা সাহেবের অভাব-অনটনের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তিনি বলেন, 'আমার নিকট একটি কড়িও থাকতো না যে, তা দিয়ে রুটি কিনে খাবো, আম্মাজান, সহোদরা বোন এবং আমার যিম্মায় থাকা ঘরের লোকদের খাওয়াবো। খরবুযার মূল্য এতো কম থাকা সত্ত্বেও পুরো মৌসুম পেরিয়ে যেতো, কিন্তু খরবুযার স্বাদ নেওয়া নসীব হতো না। কিন্তু আমি আমার এ অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকতাম এবং কামনা করতাম যে, যতোগুলো ফসল (মৌসুম) বাকী রয়েছে সেগুলোও কেটে যাক এবং আমি এ অবস্থার ওপর থাকি।'

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.রও তালেবে-ইলমী যিন্দেগী বড়ই কষ্টে কেটেছে। হলি পাতা খেয়ে খেয়ে ইলম হাসিল করেছেন। রামপুর অবস্থানকালে একবার কেউ একজন বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছে যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। মাওলানা যখন একথা জানতে পারলেন তো তাঁর মায়ের নিকট চিঠি লেখলেন যে, আমি জীবিত রয়েছি। তাঁর আম্মাজান তাঁর আব্বাজানকে বাড়ি হতে রামপুর পাঠিয়ে দিলেন যে, তাঁকে দেখে আসবেন। কারণ, মাওলানা বাড়ি ছেড়েছেন থেকে তখনও বাড়ি যাননি। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন যে, পড়ালেখা শেষ করেই তবে বাড়ি ফিরবেন। তাঁর আব্বাজান আসলে তার নিকটও তাঁর এ ইচ্ছের কথা প্রকাশ করলেন। তাঁর আব্বাজান খুশী হলেন। বললেন, 'আমারও মত এটা।' মাওলানার নিকট বিছানা ছিলো না। তিনি আব্বার জন্য কোথাও হতে বিছানা এনে তাঁকে শুইয়ে দিলেন। আর নিজে মুতালা'আর জন্য বাজারের বাতির আলোর নিকট গেলেন। মুতালা'আ থেকে অবসর হয়ে আসলেন এবং মসজিদে বসে রইলেন। ঠান্ডা যখন অসহনীয় হয়ে উঠল তো চাটাইয়ের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। এভাবেই রাত কাটিয়ে দিলেন।

'আপবীতী'র মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব হযরত রায়পুরী রহ.র বর্ণনা করা একটি ঘটনা লিখেন। 'তালেবে-ইলমীর যমানায় একবছর এমন হয়েছে যে, শীতের কোনো পোশাক, লেপ, কম্বল, ইত্যাদির কিছুই ছিলো না। আত্মসম্মানবোধের কারণে কারো নিকট প্রকাশও করিনি। মাগরিবের পর কিতাব নিয়ে যে মসজিদের মধ্যে কিয়াম করা হতো সে মসজিদের হাম্মামের সামনে বসে যেতাম। ইশার নামাযের পরও সেখানে বসে যেতাম। লোকেরা ভাবতো, কারো কারো আগুন পোহানোর বাতিক হয়। এরও এ শখ রয়েছে। যখন সকল মুসল্লী চলে যেতো তো মসজিদের দরজা আটকে মসজিদের কোনোয় 'ছফ'-এর ওপর শুয়ে এবং ছফকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে পার্শ্ব ফিরে অপর কোনায় চলে যেতাম। সেগুলো সব আমার ওপর লেপ্টে যেতো। সেগুলোই ওড়না-বিছানা ছিলো। মাথা ও পায়ের দিক থেকে রাতভর অনেক

বাতাস বইতো। যখন রাত শেষ হতো তো ঐ ছফ হতে পার্শ্ব বদলাতে বদলাতে অপর দিকে এসে যেতাম। পুরো ছফ ফরশ হয়ে যেতো।'

'শায়খুল কুল্ল' শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ.র তালেবে-ইলমীর যমানায় জুতো ছিড়ে গিয়েছিলো। ছয় মাস পর্যন্ত এ অবস্থায়ই কাটিয়ে দিয়েছেন।

মাযাহেরুল উলূমের বর্তমান নাযেম মাওলানা আস'আদুল্লাহ সাহেব দা. বা. যখন থানাভবনে পড়ালেখা করতেন তো সেখানকার নিয়ম ছিলো, শীতকালে গরম পানি দ্বারা অযু করলে সপ্তাহে দু'পয়সা দিতে হতো। হযরত মাওলানা বলেন, 'আমার নিকট এ-পরিমাণও থাকতো না। তাই ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করতাম। খানা-পিনার প্রতি ততোটা গুরুত্ব দিতাম না। যা কিছু মিলে যেতো খেয়ে নিতাম। না মিললে তার ওপরই আল্লাহর শোকর আদায় করতাম।'

যখন তালেবে-ইলমী যিন্দেগীতে এ ধরনের কষ্ট সহ্য করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা খানকাহ ও মাদরাসার খিদমতের জন্য তাঁদের মনোনীত করে নেন। কে বলতে পারবে যে, এতো কষ্টে-সৃষ্টে জীবন যাপনকারী এ তালেবে-ইলম ভবিষ্যতে শায়খে কামিল ও ইলমে নবুয়্যতের বড় আলেম হবে? রায়পুর ও সাহারানপুর থেকে লোকদের যে ফয়েয পৌঁছছে, তা কারও নিকট গোপন নেই। কারও মনে চাইলে এখনও দেখে নিতে পারে।

বর্তমানের তালেবে-ইলমেরা যদি চায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে কাজ নিক, তাহলে নিজেকে এর জন্য তৈরী করা চাই এবং আকাবিরদের নমুনা হওয়া চাই, তবেই দ্বীনের খিদমতের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে, তালেবে-ইলমরা সবসময়েই আরাম-আয়েশই চায়। এ জন্য তারা স্ট্রাইক করে, সবক বর্জন করে ও উস্তাদের লাঞ্ছনা করে যে, তারা মাদরাসা যেভাবে চলতে চায় সেভাবে চলতে দেওয়া হয় না কেন? কেন তাদের অন্যায় পথে চললে শাস্তি দেওয়া হয়? খাবার দিতে একটু বিলম্ব হলে কিংবা তরকারীর ঝোল একটু পাতলা হলে মহা হুলস্থূল বাধিয়ে দেওয়া হয়। আশ্চর্যের কথা হলো, এসব দাবী করে সে-সকল ছাত্র, যারা মাদরাসা থেকে সাহায্য পাওয়ার হকদার নয়। বরং নিজেই সাহেবে-নিসাব। তাদের আসবাব-পত্র প্রয়োজনের থেকে এতো বেশী যে, হিসেব করলে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের অবস্থা গোপন রেখে নিজেকে হকদার সাব্যস্ত করে মাদরাসা থেকে ওযীফা নেয়। আবার সামান্য কারণেই হাঙ্গামা সৃষ্টি করে।

আমি (লেখক) যখন মুরাদাবাদে হযরত মাওলানা আযব নূর সাহেব থেকে 'মা'কুলাত'-এর কিতাব পড়ছিলাম তখন এক তালেবে-ইলম আমার নিকট এসে

'শাফিয়া' কিতাব পড়ার জন্য অনুরোধ করলো। আমার কিতাব অনেক ছিলো। মুতালা'আ ও তাকরার থেকে সুযোগ পাওয়া যেতো না। কিন্তু সে বারবার অনুরোধ করতে লাগলো। সে তালেবে-ইলমের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, মাদরাসা বন্ধের সময়ে মযদূরী করতো। যতোদিন পর্যন্ত পয়সা থাকতো, খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা তা থেকেই করতো। শেষ হয়ে গেলে কারও নিকট চাইতো না। প্রচন্ড ক্ষুধা পেলে সন্ধ্যার সময়ে সবজীমন্ডি গিয়ে পড়ে-থাকা পাতা কুড়িয়ে নিতো। সেগুলো উতরিয়ে নিয়ে লবন ঢেলে খেয়ে নিতো। আমি অনেকবারই সাথে খাওয়া খাওয়াতে চাইলাম। কিন্তু সে তা মঞ্জুর করতো না। মাঝে-মধ্যে অবশ্য শরীক হতো।

হাফেযুল হাদীস হাজ্জাজ বাগদাদী রহ. শাবাবা রহ. নিকট যাওয়ার সময়ে তাঁর আম্মাজান একশ' রুটি পাকিয়ে একটি কলসে ভরে তাঁর সাথে দিয়ে দিয়েছিলেন। হাজ্জাজ দিনে একটি করে রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন এবং তা'লীম হাসিল করতেন। যেদিন সে-রুটিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে, সেদিন তাঁকে উস্তাদের দরওয়াযা থেকে ফেরত আসতে হয়েছে।

শায়খুল ইসলাম বাকী বিন মুখাল্লাদ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি এমন এক তালেবে-ইলমকে জানি, যে তালেবে-ইলমীর যামানায় এতো কঠিন অবস্থায় পার করেছে যে, 'চুকান্দর' (এক প্রকার উদ্ভিদ, যা লালচে হয়)-এর পাতা খেয়ে দিন কাটাতো। এতো কষ্ট ও অভাব সত্ত্বেও সে হিম্মত হারায়নি। ইলম অর্জনে লেগে ছিলো।'

ইমাম বুখারী রহ.র তালেবে-ইলমীর সময়ে এক সফরে তিনদিন পর্যন্ত খাবারের কিছুটই মিলেনি। জঙ্গলের পাতা-দানা খেয়ে কাটিয়েছেন।

ইবনুল মুকরী, আবুশ্‌শায়খ, তাবরানী, এ-তিনজন একই সময়ে মদিনা মুনাওয়ারায় ইলম শিক্ষা করতেন। একবার তাঁদের এমন অবস্থা হলো যে, তারা রোযার পর রোযা রাখতে লাগলেন। ক্ষুধায় যখন তাঁরা অস্থির হয়ে পড়লেন, তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযায়ে-আতহারের নিকট গিয়ে আওয়ায দিলেন-

يا رسول الله صلى الله عليه و سلم الجوع

'হে আল্লাহর রসূল! আমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছি।'

এরপর তবরানী সেখানেই বসে পড়লেন যে, হয়তো খাবার আসবে নয়তো মৃত্যু আসবে। ইবনুল মুকরী ও আবুশ্‌শায়খ তাঁদের কিয়ামগাহে ফিরে এলেন। সে ডাক কী করে বিফলে যেতে পারে? কিছুক্ষণ পর ঘরের দরওয়াযায় আওয়ায

হলো। দরজা খুলে দেখতে পেলেন, এক 'উলূভী (হযরত আলী রাযি.র বশংধর) ব্যক্তি দুজন গোলাম নিয়ে উপস্থিত। গোলামদের মাথায় অনেক সামান। সে-'উলূভী ব্যক্তি বললেন, 'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছেন, যেনো তোমাদের নিকট কোনো কিছু পৌঁছিয়ে দিই।'

শায়খুল ফোকাহা ইমাম ইয়ারকানী যখন ইসফারায়েন পড়তে গেলেন তো রাস্তার মধ্যে তাঁর থেকে তিনটি আশরাফী হারিয়ে গিয়েছিলো। শুধুমাত্র দু'দিরহাম তাঁর সাথে ছিলো। ইসফারায়েন পৌঁছে তিনি সে দু'দিরহাম এক রুটিওয়ালার নিকট জমা রাখলেন। প্রত্যেক দিন তার থেকে দু'টি রুটি ক্রয় করে নিতেন এবং আহমদ বিন বশীরের নিকট থেকে একখন্ড কিতাব এনে সন্ধ্যা পর্যন্ত নকল করতেন। সন্ধ্যার সময়ে নফল-করা খন্ডটি পৌঁছিয়ে দিতেন। তিরিশটি খন্ড নকল যখন হয়েছে, তখন তাঁর দিরহাম শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁকে বাধ্য হয়ে ইসফারায়েন হতে ফেরত আসতে হয়েছে।

ইমাম আবু আলী বলখী রহ. যখন আসকালান ছিলেন, তখন তিনি এতোই কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন যে, কয়েকবারই উপোস থাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো। দুর্বলতার কারণে লেখতে পারতেন না। ক্ষুধায় যখন অস্থির হয়ে পড়তেন, তখন রুটিওয়ালার দোকানে এ উদ্দেশ্যে বসতেন যে, খাওয়ার খোশবু দ্বারা তবীয়তের মধ্যে কিছুটা শক্তি হবে।

আবু হাতেম রাযি নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, 'আমি তালেবে-ইলমীর যমানায় চৌদ্দ বছর বসরার মধ্যে থেকেছি। একবার অভাবের কারণে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, পরনের কাপড়ও বিক্রয় করতে হয়েছে। যখন কাপড়ের দামও শেষ হয়ে গেছে তো দুদিন উপোস থাকলাম। শেষপর্যন্ত এক সঙ্গীর নিকট অবস্থা বর্ণনা করলাম। সৌভাগ্যক্রমে তার নিকট এক আশরাফী ছিলো। তার থেকে অর্ধেকটা সে আমাকে দিয়ে দিলো।'

আবুল আ'লা হামদানীকে একব্যক্তি বোগদাদে এ অবস্থায় দেখেছেন যে, তিনি মসজিদের চেরাগে, যা ওপরে রাখা ছিলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, যদি তেল কেনার পয়সা থাকতো তাহলে এতো কষ্ট কেনো করতে যাবেন?

আবুল মনসূর ফারাবীর তালেবে-ইলমীর যিন্দেগী এতো খালিহাতে কেটেছে যে, চেরাগের তেল ক্রয় করতে পারতেন না। রাতের দারোয়ানদের বাতির আলোয় মুতালা'আ করতেন।

এসব অভাব-অনটনের মধ্যে তাঁরা সে-'ইলমী তারাক্কী' করেছেন যার দ্বারা সারা দুনিয়া ফয়েযপ্রাপ্ত হচ্ছে। আজকাল সব রকম আসানী সত্ত্বেও তালেবে-ইলমদের

অবস্থা যা, তা সবার জানা। মাদরাসা থেকে 'ইমদাদ' পাওয়া যায়। বাড়ি থেকে আবার আলাদাভাবে টাকা-পয়সা আসে। এরপরও তাদের অভাবের অভিযোগ রয়েছে। সেটা পূরণ করার জন্য টিউশনি তালাশ করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, তিন-ওয়াক্তের চা-নাস্তা, পান, ঘড়ি-চশমা, শেরওয়ানী, উত্তম পোশাক, উত্তম খাবার, এগুলো যখন জীবনের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিণত হয়, তো টাকা যতোই দেওয়া হোক, অভাব থেকেই যাবে। অথচ তাদের সামনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ-বাণী বারবার এসেছে-

اياك و التنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين

'নায ও নিয়ামতের জীবন-যাপন থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, আল্লাহর বান্দারা এমন জীবন পছন্দ করে না।'

এ বিলাসিতার জীবন-যাপন মুতালা'আ ও কুতুববীনীর আগ্রহ থেকে দূরে রেখে এর মিসদাক বানিয়ে দিয়েছে-

'সারা জীবন এভাবেই কেটেছে যে, গরমকালে এ চিন্তা হয়েছে যে, কী খাবো? আর শীতকাল এ চিন্তায় কেটেছে যে, কী পরবো?'

আজকাল তো পেট-রুটির ধান্দা মানুষকে দ্বীন-ধর্ম থেকে বিমুখই করেনি, বেজারও করে দিয়েছে। আল্লাহ! তুমি আমাদের সবাইকে হিফাযত করো!

আল্লামা রুমী রহ. বলেন-

'তোমার দেহ পালন করা ও দেহ সাজানো শেষপর্যন্ত তোমাকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলবে।'

ইমাম তবরানীর ইলমের প্রশস্ততা দেখে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি এ-পরিমাণ জ্ঞান কীভাবে অর্জন করেছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তিরিশ বছর পর্যন্ত আমার কোমর চাটাই ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর স্বাদ নেয়নি।'

ইমাম বগভী রহ. একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। 'বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন' কিতাবে লেখা রয়েছে, তিনি নামায পড়ে রাত কাটাতেন এবং দিনের বেলায় রোযা রাখতেন। যুহ্দ ও কানা'আতের জীবনযাপন করতেন। ইফতারের সময়ে শুকনো রুটি দিয়ে ইফতার করতেন। লোকেরা যখন বারবার বলতে লাগলো যে, শুকনো রুটি খেলে মস্তিষ্কের ক্ষতি হবে, তখন তিনি তরকারী হিসেবে যাইতুনের তেল ব্যবহার করতে লাগলেন।

মীর মুবারক মুহাদ্দিসে বলগরামী একদিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি বললেন, 'তিন দিন যাবৎ কোনো খাবারের ব্যবস্থা

হয়নি।' তাঁর শাগরেদ মীর তোফায়েল খানা তৈরী করে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'তুমি যখন আমার অবস্থা জেনে চলে গিয়েছিলে, তখন আমার নফস খাওয়ার আশা বেঁধেছিলো। এতে 'ইশরাফে নফস' হয়েছে। তাই আমি এ খাবার খাবো না।' মীর তোফায়ের কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি না করে সামনে থেকে খানা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খানা পেশ করে উস্তাদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হযরত! আমি যখন খানা নিয়ে চলে গিয়েছিলাম, তখন হযরতের এ আশা ছিলো না যে, তা আবার আমি আনবো।' তিনি বললেন, 'না।' তখন তিনি আরয করলেন, 'এখন তো আর 'ইশরাফে নফস' নেই। তাই খাবার গ্রহণ করুন।' নেককার শাগরেদের এ সুকৌশলের ওপর তিনি আনন্দিত হলেন; বললেন, 'তুমি আশ্চর্যরকম বুদ্ধিমত্তার কাজ করেছো!'

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.র জীবনীতে রয়েছে, তিনি কয়েকদিন উপোস ছিলেন। দিল্লীতে পড়ালেখা করতেন। সেখান থেকে বাড়ি আসছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করলেন। পথিমধ্যে একটি ঝোপের মধ্য হতে একটি হাত বেরিয়ে রয়েছে, যার মধ্যে মিঠাইর একটি পাত্র ছিলো। তিনি বলেন, আমি তা নিয়ে নিয়েছি।

মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেব ইলাহবাদী তালেবে-ইলমীর পুরো যমানা একটি ছোট কুঠরীতে কাটিয়েছেন।

আমার (লেখকের) দাদা যখন পানিপথে রঈসুল মুহাদ্দেসীন হযরত মাওলানা ক্বারী আব্দুর রহমান সাহেবের নিকট পড়তেন, তখন একদিন তিনি ক্ষুধায় অস্থিত হয়ে পড়েছিলেন। ছোলা নিয়ে খাচ্ছিলেন। এ সময়ে হযতর মাওলানা ক্বারী সাহেব তাশরীফ আনলেন। দেখে বললেন, 'কী খাচ্ছো?' মরহুম দাদা বলেন, 'আমি বড়ই লজ্জিত হলাম। কারণ, হযরত হয়তো মনে করবেন, মাদরাসার খাবারের ওপর আমি তুষ্ট নই।' এর আসর এই হয়েছে যে, এরপর তালেবে-ইলমী যিন্দিগীতে কোনো কিছু কিনে খাননি। যে খাবার মিলতো, তার ওপরই তুষ্ট থাকতেন।

হযরত মাওলানা আব্দুল গনী সাহেব ফুলপুরী রহ. তালেবে-ইলমীর যমানা অনেক কষ্টে কাটিয়েছেন। মাত্র এক জোড়া কাপড় ছিলো। সেটা ধুয়ে পরতেন। হযরতের এ-অবস্থা শেষ পর্যন্ত ছিলো। সাদা কাপড়ের জামা ও লুঙ্গি পরিধান করতেন। এ সাদাসিধে চলার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সে-ভীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা রাজা-বাদশাদেরও ছিলো না। মানুষের নিকট এতো প্রিয় ছিলেন যে, লোকেরা তাঁর ইশারায় জান দেওয়ার জন্যও তৈরী ছিলো।

মুসলিহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা শাহ ওসীউল্লাহ সাহেব রহ.র জীবনীতে রয়েছে, তালেবে-ইলমীর যমানায় অনেক সময়েই এমন হতো যে, তাঁর নিকট কোনো পয়সা থাকতো না। কিন্তু তাঁর ইসতিগনার অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তিনি কারো নিকট কোনো কিছু চাইতেন না। তাঁর কিয়ামগাহ মাদরাসা থেকে দূরে ছিলো। মাদরাসা থেকে শুকনো নিয়ে রুটি নিতেন এবং লবন বা গুড় দিয়ে খেয়ে নিতেন।

কানপুরে যখন অধম (লেখক) তা'লীম হাসিল করছিলাম, তখন আমার ফুফাতো ভাই মওলবী সাইয়্যেদ নিয়ামতুল্লাহও সাথে ছিলো। 'জামেউল উলূমে' হিফয পড়ছিলো। হিফয বিভাগের ছাত্রদের জন্য মাদরাসার পক্ষ থেকে ওযীফার ব্যবস্থা ছিলো না। তখনকার সময়ে এক পয়সা দ্বারা একটি বড় বিস্কুট পাওয়া যেতো। সারাদিনে মাত্র একটি বিস্কুট খেয়ে কাটতো। কখনও-কখনও এক পয়সার ছোলা কিনে খেয়ে নিতো। রাতের বেলায় দু' খাবারে চারজন শরীকের সাথে সেও শরীক হয়ে যেতো। এভাবে প্রায় একবছর যাওয়ার পর আমরা উভয় পানিপথ থেকে চলে এলাম।

হযরত মুফতীয়ে-আযম মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব দেহলভী রহ. কোরআনে পাক ও উর্দূ-ফারসীর প্রাথমিক কিতাবগুলো শেষ করার পর শাহজাহানপুরের 'খলীলে-শরকী'তে অবস্থিত মাদরায়ে-এ'যাযিয়ায় 'সিকান্দার নামা' ও আরবীর প্রথমিক কিতাবগুলো পড়েছেন। মাদরাসার আরবী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষক হাফেয বধন খাঁ ও মাওলানা আব্দুল হক খাঁ ছিলেন। তাঁরা মুরাদাবাদের শাহী মসজিদের মাদরাসায় সামনের কিতাব পড়ার জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। তখন হযরত মুফতী সাহেবের বয়স প্রায় পনের বছর ছিলো। মাওলানা আব্দুল হক খাঁ একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। নায়েবে-মুহতামিম হাজী মুহাম্মদ আকবর খাঁ সাহেব চিঠি পেয়ে খুবই অনুগ্রহ দেখালেন। তিনি অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য হাতিখানার মসজিদে মওলবী আব্দুল খালেক সাহেবের নিকট পাঠালেন। এরপর স্থায়ীভাবে থাকার জন্য হাফেয মুহাম্মদ ইসমাঈল ওকীলের কাছারীঘর ঠিক করে দিলেন। খাওয়ার ব্যবস্থা মাদরাসার পক্ষ থেকেই করা হতো। অন্যান্য খরচের টাকা নিজেই রোযগার করে নিতেন। তালেবে-ইলম থাকাকালে তিনি কোনো মসজিদে থাকেননি। নিজের বহনের বোঝা অপরের ওপর চাপাননি। মুরাদাবাদ ও দেওবন্দ থাকাকালে তিনি সুতোর টুপি বুনে বিক্রয় করতেন। শাহীমুরাদাবাদে শিক্ষাকালের দু'বছর কাটিয়েছেন। ১৩১২ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হলেন। মাদরাসার দারুল-ইকামায় তিন বছর ছিলেন।

কয়েকজন সাথীর সাথে শরীক হয়ে খাবার পাকাতেন। তরকারী নিজেই পাকিয়ে নিতেন। বাজারের এক সরাইখানা থেকে রুটি পাকিয়ে আনা হতো। তিনি আনুমানিক বাইশ বছর বয়সে ১৩১৫হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা সবার জানা।

তালেবে-ইলমী যমানায় দুঃখ-কষ্ট করার এরূপ হাজারও ঘটনা আল্লাহর সে-সব বান্দাদের রয়েছে, যাঁদের থেকে আল্লাহ দ্বীন ও ইসলাহের কাজ নিয়েছেন।

দশম আদব

শায়খে-কামিলের সাথে ইসলাহী তা'আল্লুক কায়েম করা

তালেবে-ইলমী যমানায়ই শায়খে-কামিলের সাথে ইসলাহী তা'আল্লুক রাখবে এবং প্রত্যেক কাজ তাঁর পরামর্শ মতেই করবে। ফারেগ হওয়ার পর তাঁর সাহচর্যে থেকে নিজের যাহের ও বাতেন ইসলাহ করে নিবে। এরপর কোনো দ্বীনি খিদমত শুরু করবে। ইসলাহ ব্যতীত ইখলাস পয়দা হওয়া মুশকিল বিষয়। নিজেই যখন নফসের ধোঁকা-ফেরেব সম্পর্কে অবগত থাকবে না তো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ইসলাহের পরিবর্তে ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সাধারণত এ শ্রেণীর মধ্যে যে অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, এর বড় কারণ এটাই।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب

কাজেই উলামায়ে-কিরাম, যাঁরা নবীর উত্তরসূরী, তাঁদেরও যিকির-ফিকির, মুরাকাবা-মুহাসাবা, খুলূয়্যত ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া চাই।

দরস ও তাদরীস, তাসনীফ ও তালীফের মত প্রিয়কাজ করার পরও এবং সকল শ্রেণীর মানুষের কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও ইমাম গাযালী রহ.র তবীয়তে কেন অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিলো তা স্বয়ং তাঁর মুখেই শোনা যাক। তিনি বলেন, 'তাদরীস ও তালীমকে সবচেয়ে উত্তম কাজ মনে করতাম। কিন্তু তালাশ করার দেখতে পেলাম যে, আমার সমস্ত মনোযোগ সে-সকল উলূমের প্রতি, যেগুলো গুরুত্বপূর্ণও নয় এবং পরকালের ক্ষেত্রে ফায়দামান্দও নয়। আমি আমার তাদরীসের নিয়্যতের প্রতি লক্ষ করে দেখলাম যে, তা-ও খালেস আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিলো না। বরং এর প্রতি আমাকে প্রভাব ও প্রতিপত্তির লোভ পরিচালিত করেছে। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমি ধ্বংসের গুহার কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি যদি ইসলাহের চেষ্টা না করি তাহলে তা আমার জন্য বড় বিপদের কারণ।'

প্রায় এগার বছর পর্যন্ত নফসের তাযকিয়া, আখলাক, নফসের সংশোধন ও সজ্জিতকরণ এবং যিকরুল্লাহর মাধ্যমে নিজের নফসকে পবিত্র করার মধ্যে মশগুল থাকলেন। সে সময়ে যা কিছু হাসিল হয়েছে তৎসম্পর্কে তিনি বলেন-

'সে একাকীত্বের মধ্যে আমার নিকট যা প্রকাশ পেয়েছে এবং যা কিছু হাসিল হয়েছে সেটার ব্যাখ্যা করা তো সম্ভব নয়। কিন্তু পাঠকদের এতোটুকু অবশ্যই বলবো, আমার নিশ্চিতরূপে জানা হয়ে গেছে যে, সূফীয়ায়ে কিরামই আল্লাহর পথের পথিক। তাঁদের সীরতই হলো উত্তম সীরত। তাঁদের পথ সবচেয়ে বেশী সঠিক এবং তাঁদের আখলাক সবচেয়ে বেশী সহীহ। যদি জ্ঞানীদের জ্ঞান, প্রজ্ঞাবানদের হিকমত এবং শরীয়তের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাতদের ইলম মিলেও তাঁদের সীরত ও আখলাক থেকে উত্তম কিছু আনতে চায় তবে তা সম্ভব নয়। তাঁদের প্রত্যেকটি 'হরকত ও সুকুন' হতো নবীর অনুসরণে। আর নূরে-নবুয়্যত থেকে বেড়ে আর কোনো নূর যমীনের ওপর নেই, যার থেকে আলো পাওয়া যেতে পারে।'

খুলূয়্যতের মধ্যে এ নূর অর্জন করার পর আবার মাদরাসায়ে নিযামিয়ায় দরসের খিদমতে আসীন হয়ে দ্বিতীয়বার তাদরীসের কাজ শুরু করেন। কিন্তু প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারের মধ্যে যে-পার্থক্য ছিলো সে-সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য ছিলো। প্রথম অবস্থায় সে-উলূমের প্রচার ও প্রসার করেছি, যা ছিলো প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের মাধ্যম। আর আমি আমার কথা ও কাজ দ্বারা সেটার দিকেই দাওয়াত দিতাম। আর এটাই আমার উদ্দেশ্য ও নিয়্যত ছিলো। কিন্তু এখন আমি সে-ইলমের দাওয়াত দিচ্ছি, যার দ্বারা প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। নিজের ও অপরের ইসলাহ কামনা করি।'

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ. উস্তাদদের উস্তাদ ও বুযর্গ ছিলেন। উলামা ও তালাবার ভীড় তাঁর পাশে লেগে থাকতো। সূফীয়ায়ে কিরামও তার থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত হতেন। তাঁর সওয়ারী বের হলে উলামা ও তালাবার সাথে আমীর-উমারাদেরও একটি দল থাকতো। এতোসব সত্ত্বেও তিনি নিজের মধ্যে শূণ্যতা অনুভব করলেন, যে কারণে তিনি শামসে-তিবরীযীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট থেকে রিয়াযত ও মুজাহাদায় জীবনের বড় একটি অংশ পার করে দেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে নতুন জীবন দান করেছেন, যার ফলে লাখো মুরদা দিল যিন্দা হয়েছে, তা দুনিয়াবাসীর নিকট স্পষ্ট। এ-সব হলো শায়েখে-কামিলের সোহবতের ফল।

বাস্তবসত্য হলো, মানুষ প্রথমে আল্লাহর গোলাম হয়। তারপর দুনিয়ার ইমাম হয়।

হযরত পীরানে-পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ., হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ., হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী রহ., খাজা শিহাবুদ্দীন

সোহরোয়ার্দী রহ., খাজা বখতিয়ার কাকী রহ., হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী সিরহান্দী রহ., হযরত সাবের কালিরী, হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া প্রমুখের 'হালাত' সম্পর্কে কিতাব রয়েছে। সেগুলো দেখলে জানা যায়, তাঁরা নিজের ইসলাহের জন্য কী ধরনের রিয়াযত-মুজাহাদা করেছেন? দীর্ঘদিন শায়খের সোহবতে থেকে নিজের নফসকে কীভাবে পরাভূত করেছেন? এরপর দুনিয়ার মধ্যে যে-ইসলাহর কাজ তাঁরা করেছেন, তা দুনিয়াবাসীর নিকট স্পষ্ট।

হযরত সাইয়্যেদ শাহ ইলমুল্লাহ সাহেব রহ. হযরত সাইয়্যেদ আদম বানুরী রহ.র খিদমতে পড়ে থাকতে গিয়ে অনেক কষ্ট-মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু সুলূকের সকল মনযিল অতিক্রম করে নিজের বাতেনী নূর দ্বারা দুনিয়াকে আলোকিত করেছেন।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী রহ., হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ রহ., হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁদের কালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হয়েও শেষ পর্যন্ত কী অর্জন করার জন্য হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে-মক্কী রহ.র দরবারে হাযির হয়েছেন? তাঁরা দীর্ঘকাল তাঁর থেকে তরবিয়্যত নিয়ে যমানার মুজাদ্দিদ ও ইমামে রাব্বানী হয়েছেন।

কুতুবে ওয়াক্ত হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব এবং শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. একটি দীর্ঘ সময় ইমামে রাব্বানীর খিদমতে থেকে তারবিয়্যত হাসিল করেছেন।

নিকট-অতীতের বুযুর্গদের মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী রহ.র জীবনীতে রয়েছে, 'তিনি বছরের পর বছর তাঁর শায়খ হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম রহ.র খিদমতে থেকে নফসের ইসলাহ করেছেন। সে-সময়ে তিনি যে মুজাহাদা করেছেন এটা তারই অংশ।' তাফসীলী হালত তাঁর জীবনীতে দেখা যেতে পারে।

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গনী সাহেব রহ. এবং হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ সাহেব রহ. তাঁদের জীবনের একটি বড় অংশ তাঁদের শায়খের সোহবতে কাটিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে মুজাহাদা করেছেন। এগুলোর প্রত্যক্ষকারী এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তাঁদের থেকে হাযারো ব্যক্তি ফয়েযপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং এখনও এর সিলসিলা জারী রয়েছে।

বর্তমানকালে আল্লাহর বান্দারা, যাঁরা 'রুশদ ও হিদায়াত'-এর কাজ করছেন, তাঁরা আগে নিজেকে সাজিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ওপর এ খিদমত সোপর্দ করেছেন।

এ বিষয়ে আকাবিরদের, যাঁরা রিয়াযত-মুজাহাদা ও শায়খের সোহবতে থেকে নিজেকে পবিত্র করেছেন, তাঁদের সকলের উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে দোষণীয় বিষয় হতে মুক্ত করে সৌন্দর্য দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করতে চায় তবে কোনো কামিল ব্যক্তির মাধ্যম ব্যতীত সে-উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না। বিশেষ করে এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে দ্বীনি খিদমতের আগ্রহ রয়েছে, চাই মাদরাসার মধ্যে থেকে অথবা অন্য কোনো তরীকায়, তার জন্য আবশ্যকীয় হলো প্রথমে নিজেকে সজ্জিত করে নিবে। পরে অন্যদের সাজানোর ফিকির করবে। অন্যথায় সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইসলাহের পরিবর্তে ফিতনা-ফাসাদের এমন ক্ষতিকর দরওয়াযা খুলে যাবে, যা বন্ধ করা মুশকিল হবে।

এটা স্পষ্ট বাস্তবতা যে, কাঁসা-পিতলকে সোনা বানানোর কিমিয়া (কেমিক্যাল) সবার নিকট থাকে না এবং সবাই তা জানেও না। সেটা শিখার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির গোলামী করা হলো এর প্রথম শর্ত। তো একথা কীভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, মানুষকে প্রকৃত-মানুষ বানানোর কিমিয়া প্রত্যেক নিকট থাকবে এবং চাইলে 'ইরশাদ'-এর আসনে বসে যাবে।

এর জন্যও কোনো আল্লাহওয়ালার জুতো সোজা করার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর হিদায়াত মুতাবিক নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। তখনই গিয়ে নফসের পিঞ্জিরা ও সেটার ধোঁকা থেকে মুক্তি মিলবে এবং হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছুনো যাবে।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে এর তৌফীক দান করুন এবং সবার ওসিলায় এ পাপীকেও ইসলাহ করে দিন।

"জামে' নসীহত"

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী রহ. বলেন-

'আজকালকার তালেবে-ইলমরা একথা ভেবে রেখেছে যে, পড়ালেখা থেকে ফারেগ হওয়ার পর আমলের দিকে মনোযোগী হবো। এটা সম্পূর্ণরূপে একটা শয়তানী ধোঁকা, যার ফলে জীবনভর কখনো আমল করার তাওফীক হয় না। মনে রেখো, সব কিছুরই প্রথমবার যে আছর হয়, সেরূপ পরবর্তীতে কখনো হয় না। যখন ইলম হাসিল করার সময়ে কোনো কাজের সওয়াব বা গুনাহ জানা যায়, সে-সময়ে অন্তরের মধ্যে একটা খাস আছর হয়। যদি সে-আছর দ্বারা সে-সময়ে কাজ নেওয়া যায় এবং আমলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া যায়, তো সে-আছর পরবর্তীতেও বহাল থাকবে। তা না হলে সে-আছর অন্তর থেকে চলে যাবে; দ্বিতীয়বার আর তা সহজে অর্জিত হবে না। যখন কোরআন-হাদীস পড়ার সময়ে তুমি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে গেলে, কিন্তু তোমার অন্তরে তারগীব-তারহীবের কোনো আছর পড়লো না, তো পরবর্তীতে কীভাবে এ আশা করা যেতে পারে যে, তা তোমার অন্তরে প্রভাব ফেলবে? যখন শুরু থেকেই তুমি এ খেয়াল করে চোখ বন্ধ করে রেখেছো যে, এগুলোর ওপর আমল করার সময় এটা নয়; তবে স্নেহের ভাই, এ আশাও করো না যে, পড়ালেখা শেষ করার পর সেটার কোনো আছর তোমার অন্তরে পড়বে। প্রথমবারই যখন তোমার অন্তর সেটাকে পিছিয়ে দিয়েছে তো পরে আবার কী করে সেটা আছর কবুল করবে?

আজকালকার তালেবে-ইলমরা এটা বুঝে রেখেছে যে- يجوز لطالب العلم ما لا يجوز لغيره 'তালেবে-ইলতের জন্য এমনসব বিষয় জায়েয যা অন্যের জন্য জায়েয নয়।' এটা কি কোনো আয়াত বা হাদীস? না কি এটা কোনো ইমামের ফতওয়া? এর কোনোটিই নয়। এটা শুধুমাত্র নফসের শয়তানী। আমরা যদি একথা মেনে নেই যে, ইলম হাসিল করার সময়ে তালেবে-ইলমের জন্য বেশী-বেশী নফল নামায পড়া বা ওযীফা পালন করা সমীচীন মনে হচ্ছে না, আর এটাও তার জন্য, যে তালেবে-ইলম মুতালা'আ ইত্যাদি থেকে ফুরসৎ পায় না; কিন্তু এর মতলব মোটেই এটা নয় যে, তালেবে-ইলমের জন্য হালাল-হারাম খেয়াল রাখার প্রয়োজন নেই, বেধকড় মিথ্যা বলে যাবে, গীবৎ-শেকায়েত

করবে, অহংকার ও আত্মরম্ভিতা ইত্যাদি করে যাবে। নামাযের গুরুত্বও দিবে না। সূরত-সীরতে শরীয়তের পাবন্দী করবে না। সর্বনাশের কথা হলো, আসাতেযায়ে-কিরাম এসব দেখেও তাদের সতর্ক করে না। পরীক্ষায় যদি ফেল করে তবে হাযারও ভাবে তার ওপর কঠোরতা করে। আর যদি পরীক্ষায় পাশ করলো তো তার আমলের সাথে কোনো প্রকার দ্বিমত নেই। বে-তাকাল্লুফ তাকে পড়িয়ে যেতে থাকে এবং ফারেগ হওয়ার পর তাকে সনদ দিয়ে থাকে। অথচ, খোদার কসম! ইলমের প্রকৃত পরীক্ষা হয় আমল দ্বারা। এর মধ্যে যে সম্পূর্ণরূপে সফল হলো, তাকে কামিয়াব মনে করা চাই। আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কিতাবের অর্থ ও মতলব বোঝার পরীক্ষা তালেবে-ইলম থেকে নেওয়া হবে না। বরং উদ্দেশ্য হলো, ইলমের যে প্রকৃত পরীক্ষা সেটাকে পিছে ফেলা না চাই। এ বে-আমলী অবস্থায় এ ব্যক্তি সনদ নিয়ে ওয়াযের মসনদে বসে লোকদের নসীহত করতে থাকলে লোকদের ওপর কেমন মন্দ আছর হবে যে, আলেমরা যবান দ্বারা অনেক কথাই বলেন, কিন্তু নিজের আমল দ্বারা নিজের কথাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেন।

এতে হেদায়েতের পরিবর্তে তাদের আমল না করার সাহস বেড়ে যাবে।

হে সম্মানিত বুযুর্গগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে এ অবস্থার পরিবর্তন জলদি করুন। দেখুন! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته

'তোমাদের প্রত্যেকেই (অধীনস্থদের) রক্ষক। তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

কাজেই হে আসাতেযায়ে-কিরাম! আপনি আপনার তালেবে-ইলমদের রক্ষক; আর তারা হলো আপনার অধীনস্থ। কাজেই আপনি যদি তাদের আমলী হালত থেকে অমনোযোগী থাকেন, তবে কি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না? তাই আমাদের জন্য উচিত হলো তালেবে-ইলমের প্রত্যেকটি অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা। অনেক বেশী অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। তবে তার কোন দোষ যদি ভাব-ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ পায় বা অন্য কোনোভাবে জানা যায়, তাহলে অবশ্যই তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। বিশেষ করে আখলাকী দুর্বলতার ইসলাহ করা অবশ্যই উচিত। ফরয-ওয়াযেব ছাড়াও তাকে সুন্নাত-নফল ইত্যাদির পাবন্দ বানানো চাই। যদি চাশত ও ইশরাকের সময়ে কমপক্ষে দু'-দু'রাকা'আত নামায পড়ে নেয় এবং রাতে উঠে দু'রাকা'আত তাহাজ্জুদ আদায় করে মুতালা'আয় লেগে যায়, আর হাদীস বিভাগের তালেবে-ইলমরা অনর্থক কথা বলার পরিবর্তে

চলতে-ফিরতে যবান দ্বারা দরূদ শরীফ পড়ায় অভ্যস্থ হয়ে যায়, তবে বলুন, এতে তা'লীমের কী ক্ষতিটা হয়ে যায়? যদি একটু খেয়াল করা হয় তবে ইনশা-আল্লাহ, এমন কোনো সুরত মনের মধ্যে এসে যাবে, যাতে তালেবে-ইলমরা ইবাদতের নূর ও যিকিরের স্বাদও পাবে, সাথে-সাথে তা'লীমের মধ্যেও কোনো প্রকার ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

একটি কথা বুঝে নিন। আমল ও তাকওয়া দ্বারা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অন্য কিছু দ্বারা তা সম্ভব নয়। তো এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ইলমের জন্য উপকারী হবে না কি ক্ষতিকর? আমার বোঝে আসে না, এটাকে কেন ক্ষতিকর মনে করা হয়! তবে সুলূকের ও সূফীদের নিয়মতান্ত্রিক যিকির থেকে অবশ্যই নিষেধ করা হবে। এতে 'হালত ও কয়ফিয়্যত'-এর অবস্থা সৃষ্টি হবে, যাতে ইলম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু যেসব যিকির হাদীস শরীফে রয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলোর পাবন্দী করা ও নিয়মিতভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে থাকা তো বাদ দেওয়া যেতে পারে না। আর এটা তো অবশ্যই একটি বেমানান কাজ যে, অপছন্দনীয় আখলাক ও আমলের প্রতি অমনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও তালেবে-ইলমকে সনদ দিয়ে দিবে যেনো কওমের নেতা বনে যায়।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নস্থানে ইয়াহুদী আলেমদের সম্পর্কে বলেন- لو كانوا يعلمون 'যদি তারা জানতো!' আর আমরা নিজেরাও এর মতলব এভাবে বর্ণনা করি যে, যেহেতু তাদের আমল তাদের ইলমের পরিপন্থী ছিলো, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের ইলম থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জাহেল গণ্য করেছেন এবং لو كانوا يعلمون বলেছেন। পাঠকারী ও পাঠদানকারী এটাকে বালাগতের মাসয়ালা মনে করে থাকেন। কিন্তু একথা কল্পনাতে আনেন না যে, এর দ্বারা এ-শর'য়ী মাসয়ালাটিও প্রকাশ পায় যে, যে-আলেমের হালত তার ইলম মুআফিক না হয় সে খোদার নিকট জাহেল হিসেবে গণ্য। হাদীস শরীফে যদি এর তাফসীল দেখা যায়, তবে জানা যাবে যে, সে জাহেল থেকেও নিকৃষ্ট। কাজেই সনদ দেওয়ার সময়ে এটুকু খেয়াল রাখা চাই যে, আমরা আলেমকে সনদ দিচ্ছি, না কি শরীয়তের দৃষ্টিতে জাহেল ব্যক্তিকে সনদ দিচ্ছি। বেশ! একটু ভেবে তো দেখা চাই যে, এটা কতো শক্ত কথা যে, আল্লাহর কিতাব এক ব্যক্তিকে জাহেল বলছে, আর তোমরা দুনিয়াবাসীর নিকট তাকে দীর্ঘ প্রসংশা পত্র লিখে তাকে আলেম ও ফাযেল হিসেবে উপস্থাপন করছো। ان هذا لا اختلاق

কিন্তু এ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সাধারণ লোকেরা বে-আমল আলেমের অসম্মান ও অমর্যাদা করবে। নাউযুবিল্লাহ! মোটেই এটা নয়।

বরং তাদের সে-চিকিৎসকের মত মনে করবে, যে নিজে তো বেছে চলে না, কিন্তু অন্যকে বেছে চলার পরামর্শ দেয়। কারণ, চিকিৎসক যদি নিজে বেছে না চলে তাহলে সে মরবে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তিকে তো তার পরামর্শ মতেই চলতে হবে। যদি অসুস্থ ব্যক্তি তার পরামর্শ অনুযায়ী চলে, তাহলে অবশ্যই সুস্থ হবে। চিকিৎসক সর্বাবস্থায়ই সম্মানযোগ্য।

তদ্রূপ আলেমে-বেআমল সে-সরকারী লোকের ন্যায়, যে নিজে আইন অমান্য করে। সে আইন অমান্য করলে তার ফল সে পাবে। কিন্তু যেহেতু সে আইন সম্পর্কে জ্ঞাত, তাই মুকাদ্দমার মধ্যে তার মতামত গ্রহণ করলে উপকারই হবে। তাই সাধারণ লোকদের তাদের জিজ্ঞেস করেই আমল করা চাই।

তবে যে আলেম ভুল মাসয়ালা বর্ণনা করে, আর ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রশ্নকারীর মুআফিক ফতওয়া দেয়, তার থেকে বেঁচে থাকবে। সে খেয়ানতকারী চিকিৎসক, মিথ্যাবাদী ওকীল ও আস্ত ডাকাত। ঐ আলেমে-বেআমল যদি সহীহ মাসয়ালা বর্ণনা করে, তবে তার কথা মানবে এবং তদানুসারে আমল করবে। কিন্তু তার সোহবতে থাকবে না। সুন্নাতের পাবন্দ একজন বা-আমল আলেমের সোহবতে থাকবে। এতে আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ ও আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ভালোভাবে বুঝে নাও।'

و الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

স মা প্ত



MAKTABATUL AZHAR
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৯৮৮১৫৩২, ০১৯২৪০৭৬৩৬৫
বাংলাবাজার শাখা : দোকান নং-১, আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
ঢাকা। ০১৭১৫০২৩১১৮
ISBN 987-984-90388-19-20
987-984-90388-19-20
প্রচ্ছদ ● আরিফুর রহমান